ইস্টিশন
প্রকাশনা

Dhrubok

BBC NEWS

the Secret

পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি

অনুবাদ ও সম্পাদনা

বিকাশ মজুমদার

পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি

অনুবাদ ও সম্পাদনা

বিকাশ মজুমদার

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.blog

পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি

বিকাশ মজুমদার

প্রথম ইবুক প্রকাশ: নভেম্বর, ২০১৯

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: ধ্রুবক

ইবুক তৈরি
ধ্রুবক

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Prithibite Praner Utpotti. by Bikash Majumder

Istishon eBook

First eBook Published in **November, 2019**
Created by: Dhrubok

এই ইবুকটি ৩১ অক্টোবর ২০১৬ সালে

bbc.com-এ প্রকাশিত 'মাইকেল মারশেল' লিখিত প্রবন্ধ

'The secret of how life on earth began'-এর

ভাবানুবাদ।

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}
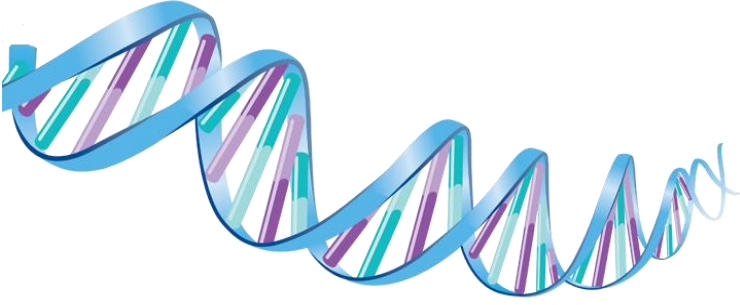
প্রসঙ্গ

পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে আজ প্রাণ প্রতিষ্ঠিত কিন্তু পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয় তখন পৃথিবী ছিল মৃত উষর গলিত পাথর। তাহলে কীভাবে জীবনের শুরু? সচরাচর এমন প্রশ্ন খুবই কম লোকেই জিজ্ঞেস করে থাকেন। মানব ইতিহাসের বেশিরভাগ পাতা জুড়ে লেখা আছে এবং প্রায় সবাই বিশ্বাস করে কোনো না কোনো ঈশ্বর আমাদের অতিপ্রিয় জীবনটা এক ফুঁৎকারে চোখের নিমিষে বানিয়ে দিয়েছেন। কিছুদিন আগেও ঈশ্বরব্যতীত অন্য কোনো ব্যাখ্যা ছিল মানুষের চিন্তারও বাইরে।

ঈশ্বর জীবনের জন্ম দিয়েছেন কথাটা এখন আর সত্য নয়। বিগত শতাব্দী ধরে কিছু বিজ্ঞানী কীভাবে প্রথম প্রাণের বিকাশ হয়েছিল খুঁজতে নিরন্তর গবেষণা করে গেছেন এবং গবেষণা বর্তমানেও চলছে। এমনকি বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষাগারে সৃষ্টির আদিতে যেমন পরিবেশ ছিল কৃত্রিমভাবে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে নিঃস্ব অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নতুন প্রাণের জন্ম দিয়েছেন।

যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে সেটা কোনো একক প্রচেষ্টা নয় কিন্তু আমরা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছি। আজকে অনেক বিজ্ঞানীই প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে অধ্যয়ন করছেন এবং তাঁরা আত্মবিশ্বাসী যে তাঁরা সঠিক পথেই আছেন এবং তাদের আত্মবিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। এটা হলো আমাদের উৎপত্তির প্রকৃত উৎস আবিস্কারের কাহিনি। আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কারকে ঘিরে আবর্তিত প্রাণের সৃষ্টি রহস্য গল্পটি মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ, সংগ্রাম এবং অসাধারণ সৃষ্টিশীলতায় পরিপূর্ণ। প্রাণের সৃষ্টিলগ্ন খুঁজতে মানব মানবীকে যেতে হয়েছে আমাদের পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় কোনায় এবং সহ্য করতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্ট। কিছু বিজ্ঞানী নিযুক্ত ছিলেন অতি দানবীয় গবেষণা এবং পরিশ্রমে, পক্ষান্তরে কোনো কোনো বিজ্ঞানীকে কাজ করতে হয়েছে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী সরকারের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে; এই ইবুকের আলোচনা প্রাণের উৎপত্তির এই লম্বা বিচিত্র গল্প নিয়েই!

বিকাশ মজুমদার
অক্টোবর ২০১৯

প্রথম অধ্যায়

Dinosaurs actually lived quite recently

(Credit: Oleksiy Maksymenko/Alamy)

প্রথম গবেষণামূলক পরীক্ষা

এটাই হলো পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির গল্প। প্রাণ অনেক পুরোনো। ডায়নোসর সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত বিলুপ্ত প্রাণী এবং প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে তারা দোর্দণ্ড প্রতাপে টিকে ছিল। কিন্তু প্রাণের জন্ম খুঁজতে আমাদেরকে আরও সুদূর অতীতে যেতে হবে। আমাদের চেনাজানা সবচেয়ে পুরোনো জীবাশ্মের বয়স প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বছর যা কিনা সবচেয়ে পুরনো ডায়নোসরের থেকেও ১৪ গুণ বেশি

পুরোনো। কিন্তু জীবাশ্মের প্রাপ্ত বয়স হয়তো আরও অতীতের হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ২০১৬ সালের আগস্টে গবেষকগণ ৩.৭ বিলিয়ন বছর আগের আণুবীক্ষণিক অনুজীবের ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন।

পৃথিবী নিজে এত বেশি পুরোনো নয়, এইতো গঠিত হয়েছিল ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে। যদি আমরা ধারণা করি প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল এই পৃথিবীতেই তাহলে সেটা যুক্তিপূর্ণ এবং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। আমাদের জানা মতে আমরা অন্যকোথাও প্রাণের অস্তিত্ব পাইনি।

These wavey patterns could be 3.7-billion-year-old fossils

(Credit: Nutman et al, Nature)

সংরক্ষিত পুরোনো জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বোঝা যায় যা কিছু ঘটেছে সেটা পৃথিবী গঠনের পরে এবং ৪.৫ বিলিয়ন বছরের মধ্যে। একই সাথে আমরা যদি প্রাণের

বিকাশ মুহুর্তের কাছাকাছি চলে যাই তাহলে প্রকৃতপক্ষেই সৃষ্টিলগ্নে কেমন ছিল তার আধুনিক ধারণা পাবো।
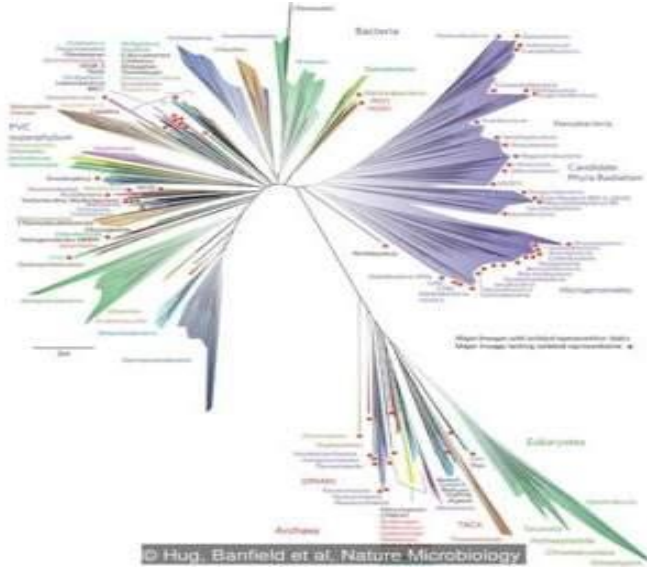
The tree of life: most of the branches are bacteria

(Credit: Hug, Banfield et al, Nature Microbiology)

১৯ শতক থেকেই জীববিজ্ঞানীগণ জানেন সব ধরণের জীবিতসত্তাই 'কোষ' দ্বারা গঠিত যা মূলত বিভিন্ন রকম এবং আকারের অতি ক্ষুদ্র জীবিত বস্তুকণার সমষ্টি। ১৭ শতকে আধুনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পরে প্রথম কোষের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কোষ থেকেই জীবনের উৎপত্তি সেটা বুঝতে প্রায় এক শতাব্দী সময় লেগেছে। বিজ্ঞানীগণ জানতে পেরেছেন আমাদেরকে একটা কোষ সৃষ্টি করতে হলে ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর পরিবেশগত অবস্থা এবং উপাদান লাগবে।

একজন মানুষ হয়তো দেখতে একটা কইমাছ বা টাইরানোসোরাস রেক্স এর মতো নয় কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গভীর পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাবো সব প্রাণীর দেহ প্রায় একই রকম কোষ দ্বারা গঠিত। এমনকি বৃক্ষলতা, অণুজীব বা মাশরুম ইত্যাদি

একই উপাদানে তৈরি। প্রাণীজগতের বেশিরভাগ প্রাণীই আণুবীক্ষণিক যাদের প্রায় সবাই একটা মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। ব্যাকটেরিয়া এককোষী প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত অতিপ্রজ এবং পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়।

২০১৬ সালের এপ্রিলে বিজ্ঞানীগণ একটা সেমিনারে 'প্রাণের বংশলতিকা'র' সর্বশেষ আধুনিক সংস্করণ উপস্থাপন করেন যেখানে সব ধরণের জীবিত প্রাণীকে বংশলতিকায় পর্বের মাধ্যমে দেখানো হয়। প্রাণীপর্বের প্রায় সব শাখাতেই ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য। তদুপরি, প্রাণীর বংশলতিকা দেখে মনে হয় সব জীবের আদি পিতা হলো ব্যাকটেরিয়া। অন্যভাবে বলা যায় প্রতিটি জীবিত প্রাণ এমনকি আপনি নিজেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়ার বংশধর। অর্থাৎ, আমরা এখন জীবনের উৎস কোথায় এই প্রশ্নের আরও যথাযথা উত্তর নিশ্চিত করতে পারবো। একটা কোষ তৈরি করতে আমাদের প্রয়োজন হবে ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগেকার পৃথিবীর উপাদান এবং প্রাণ বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ। তাহলে, প্রাণ সৃষ্টি কত দুরূহ ব্যাপার হবে?

© Equinox Graphics Ltd

A complete living cell

(Credit: Equinox Graphics Ltd)

সমগ্র ইতিহাসজুড়ে, প্রাণের বিকাশ কীভাবে শুরু হয়েছিল এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনীয়তা কখনো বিবেচিত হয়নি। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে উত্তর তো আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট। ১৮০০ শতকের আগে মানুষ বিশ্বাস করতো, প্রাণের উৎস এবং বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার পূর্ব শারীরিক এবং রাসায়নিক শক্তির মিথস্ক্রিয়ার ওপর। এটি ছিল মানুষের সহজাত ধারণা যে, সমস্ত জীবন্ত অস্তিত্ব সর্বশক্তিমানের একটি বিশেষ উপহার এবং অলৌকিকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিল যা তৈরি হয়েছিল কোনো প্রাণহীন পদার্থ থেকে। জীবন সৃষ্টিকারী রাসায়নিক উপাদানগুলো সবই সরল রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়াতে জন্ম নিলেও জীবনের সাথে সেই রাসায়নিক উপাদানগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। অলৌকিকভাবে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে, এই বিশ্বাস ধর্মবিশ্বাসের সাথে মিলে মিশে ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় শাখায় বিকশিত হয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে প্রথম মানবকে জীবন দান করতে ঈশ্বর তার মুখে ফুঁ দিয়েছিলেন এবং চির অজর অমর আত্মা প্রাণীর দেহে অলৌকিকভাবে বিরাজিত থাকে।

ধর্মীয় তত্ত্বের একটাই সমস্যা ছিল। অলৌকিকতা হলো নির্জলা ভুল ধারণা। ১৮০০ শতকের শুরুর দিকে বিজ্ঞানীগণ এমন কিছু বস্তুর সন্ধান পেলেন যেগুলো মনে হচ্ছিল জীবনের জন্য অনন্য উপাদান। সেই সব উপাদানের মধ্যে ইউরিয়া অন্যতম যা পাওয়া গিয়েছিল মূত্রের মধ্যে এবং ১৭৯৯ সালে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানের যা কিছু অর্জন ছিল সেটা অলৌকিকতার সাথে বেশি মানানসই। শুধু জীবিত প্রাণই এই ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে সুতরাং ধারণা করা হয় ইউরিয়ার মধ্যে জীবনের শক্তি সঞ্চিত ছিল এবং এই কারণেই সেই বস্তুগুলো ছিল অন্যদের তুলনায় বিশেষ কিছু।

The German chemist Friedrich Wöhler, in a lithograph

By Rudolf Hoffmann from 1856

কিন্তু ১৮২৮ সালে জার্মান রসায়নবিদ ফ্রেডরিখ ভোলার একটা সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্য অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে ইউরিয়া উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যার সাথে জীবিত প্রাণের কোনো যোগসূত্রতাই ছিল না। অন্যান্য বিজ্ঞানীগণও এগিয়ে এলেন ফ্রেডরিখ ভোলারের পথ অনুসরণ করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞানীগণ বুঝতে পারলেন, প্রাণের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এমন সাধারণ নিরীহ রাসায়নিক দ্রব্য দিয়েও রসায়নে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রাণ বিকাশে অলৌকিকতার স্থান এখানেই সমাপ্তি। কিন্তু মানুষ মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ বিকাশের ঐশ্বরিক ধারণা এত সহজে দূর করতে পারে না। অনেকেই বলতে থাকে, রসায়ন থেকে প্রাণ সৃষ্টির মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই বরং তাদের কাছে মনে হয় রোবটে প্রাণের মত ইন্দ্রজাল যা আমাদেরকে

আস্তে আস্তে যন্ত্রে পরিণত করছে। এবং এটা অবশ্যই বাইবেলের বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের সাথে সাংঘর্ষিক।

দশকের পর দশক জীবনের উৎস কোথায় এই রহস্য অবহেলিত থেকে গেছে। এমনকি বিজ্ঞানীগণ পর্যন্ত প্রাণ সৃষ্টির অলৌকিকত্বকে রক্ষা করতে রীতিমত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। যেমন ১৯১৩ সালের শেষ নাগাদ ব্রিটিশ জৈবরসায়নবিদ বেঞ্জামিন মূর 'জৈব শক্তি' নামে একটা তত্ত্বের অবতারণা করেন যেটা আসলে নতুন মোড়কে অলৌকিকতা প্রচারের প্রবল চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। বেঞ্জামিন মূরের 'জৈব শক্তি' তত্ত্বে আবেগের প্রাধান্যও যথেষ্ট ছিল। বর্তমানে মূরের 'জৈব শক্তি' তত্ত্ব অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন বহু বহু বিজ্ঞানের কল্প-গল্পে দেখা যায় একজন মানুষের জীবনী শক্তি বাড়ানো সম্ভব অথবা জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের একটা টিভি সিরিয়াল 'ডক্টর হু' এর মধ্যে একটা চরিত্র টাইম লর্ডস জীবনীশক্তি নবায়নের চিন্তা করেন যেখানে দেখা যায় শক্তি বাড়ানো হচ্ছে, যদিও ধীরে প্রবাহিত হয় তবুও সে শীর্ষে পৌঁছে যাবে। বৈজ্ঞানিক কল্প-গল্পটিকে অভিনব মনে হলেও বাস্তবে এটা অতিপুরনো একটা অলীক ধারণা মাত্র।

তারপরেও ১৮২৮ সালের পর থেকেই দেবত্ববিহীন প্রাণের বিকাশ প্রথম কীভাবে ঘটেছিলে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজতে থাকেন বিজ্ঞানীগণ। কিন্তু তাঁরা কোন যথার্থ কারণ খুঁজে পাননা। যদিও প্রাণ বিকাশের উৎস রহস্যে ঢাকা কিন্তু দশকের পর দশক অবহেলিত ছিল, তবুও তখন বিজ্ঞানীদের মনে হতে লাগল প্রাণের বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল তা অবশ্যই আবিষ্কার করার বিষয়। সম্ভবত তখনকার প্রায় সবাই সৃষ্টিতত্ত্বের প্রশ্নে অলৌকিকতাবাদে আবেগের আতিশয্যে এমনভাবে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িত ছিল যে তারা আবিষ্কারের পরবর্তী পদক্ষেপ শুরুই করতে পারছিল না।
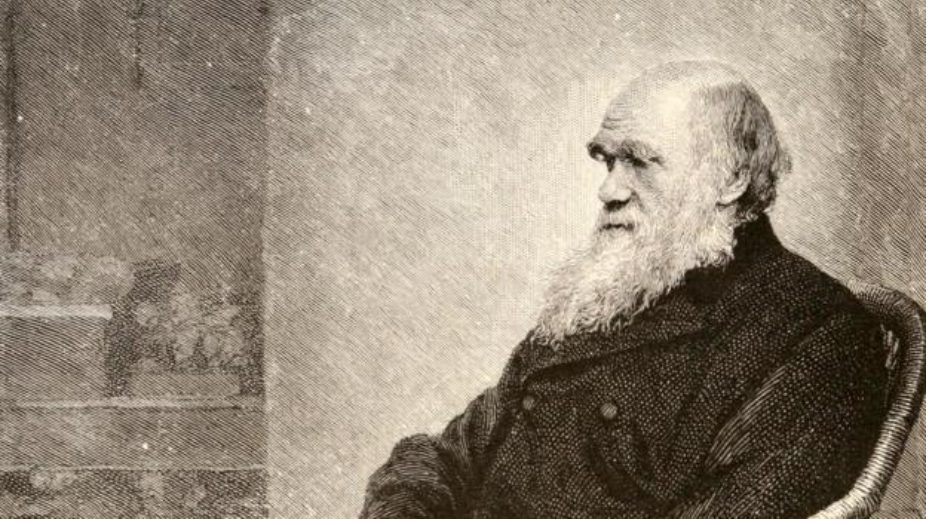
Charles Darwin showed that all life has evolved from a
Simple common ancestor

পূর্বের অচলাবস্থার পরিবর্তে ১৯ শতকে চার্লস ডারউইন এবং সহযোগীদের চেষ্টায় গড়ে তোলা বিবর্তনতত্ত্বের সুবাদে জীববিজ্ঞানে নব নব আবিষ্কারের হাতছানি দেখা দেয়। চার্লস ডারউইন জানতেন কীভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এটা খুবই গভীর চিন্তা ও আবেগ মেশানো প্রশ্ন। চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের সূচনা হয় ১৮৫৯ সালে পৃথিবী তোলপাড় করা 'অন দ্য ওরিজিন অফ স্পিসিজ' বইটি প্রকাশের মাধ্যমে। বিবর্তনবাদে তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান কীভাবে এই বিপুলা পৃথিবীর ততোধিক বিপুল পরিমাণ বিচিত্র প্রাণী জগতের উদ্ভব হয়েছে একটা সাধারণ এককোষের আদি পিতা থেকে। এই প্রথম কেউ বললেন ঈশ্বর প্রতিটি জীবকে আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেননি। প্রাণিজগৎ সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর প্রাথমিক জৈব উপাদান থেকে। প্রাণী জগতের সবাই সেই এককোষী আদিপিতার বংশধর।

চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ চারিদিকে বিতর্কের হৈচৈ ফেলে দিলো এবং বাইবেলের সাথে সাংঘর্ষিক তত্ত্বের জন্য বিতর্কিত হয়। বিশেষত উগ্র ধর্মান্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে ডারউইন এবং তার বিবর্তনবাদ ভয়ানক হিংস্র আক্রমণের শিকার হলো। কিন্তু বিবর্তনবাদের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি কীভাবে প্রথম প্রাণের বিকাশ সম্ভব হয়।

Darwin wondered if life began in a "warm little pond"

(Credit: Linda Reinink-Smith/Alamy)

ডারউইন জানতেন প্রশ্নটা অতীব গুরুতর, কিন্তু তিনি যথাসম্ভব সতর্কভাবে শুরু করেছিলেন তবুও চার্চের সাথে দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হলো না। **১৮৭১** সালে লেখা এক চিঠিতে তিনি বিবর্তনবাদ নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। আবেগমথিত ভাষায় তিনি বলতে চেয়েছিলেন, প্রাণের উৎপত্তি কীভাবে এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তিনি জানেন। প্রাণ বিকাশের প্রথম অনুকল্পটি উদ্ভূত হয়েছিল একটি সর্বগ্রাসী বাকস্বাধীনতাহীন দেশে। কিন্তু যদি (ওহহ কী বিশাল একটা যদি) আমরা বুঝতে পারি তবে দেখতে পাবো একটা ছোট উষ্ণ পুকুরে থাকে পর্যাপ্ত

এমোনিয়া এবং ফসফরাস লবণ সেই সাথে আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ এবং রাসায়নিকভাবে স্বয়ং উদ্ভূত আমিষের জটিলযৌগ আরও জটিল পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ভিন্নভাবে বলা যেতে পারে, কী ঘটেছিল যখন দীর্ঘদিন সাধারণ জৈব উপাদান একটা ছোট জলাভূমিতে সূর্যালোকে নিমজ্জিত ছিল। কিছু জৈব উপাদান হয়তো মিলেমিশে প্রাণের সদৃশ কোনো বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল আমিষ এবং আমিষ আরও জটিল কোনো বস্তুতে পরিণত হচ্ছিল। হতে পারে অস্পষ্ট ধারণামাত্র। কিন্তু ভবিষ্যতে এই অস্পষ্ট ধারণার ওপর ভিত্তি করে অনুমান করা সম্ভব প্রথম কীভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল।

এই ধারণার আত্মপ্রকাশ ঘটে সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন ঈশ্বরবিহীন প্রাণ বিকাশের মত সাহসী চিন্তা বিকশিত হয়েছে একটা গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে মানুষের বাক্ স্বাধীনতা সামাজিক ঐতিহ্যের অংশ। হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র? কিন্তু না, বাস্তব ঘটনা হলো অলৌকিকতাকে পাশ কাটিয়ে জীবনের উৎপত্তি নিয়ে প্রথম অনুমান করেন নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে যেখানে মুক্তিচিন্তা নিষিদ্ধ। তখন স্ট্যালিনের রাশিয়াতে সবকিছু রাস্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। মানুষের চিন্তা, এমনকি পঠন পাঠনের বিষয় যা কিছু কমিউনিস্ট রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় সেটাও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। ওপারিন কল্পনা করতেন, কেমন ছিল পৃথিবী যখন সবেমাত্র সৃষ্টি হলো?

সবথেকে আলোচিত ঘটনা ছিল স্ট্যালিন জীনতত্ত্বের প্রচলিত পঠন পাঠনের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আরেক জীববিজ্ঞানী এবং কৃষিবিদ ট্রোফিম ডেনিশোভিচ লিসেঙ্কো জোসেফ মেন্ডেলের জিনতত্ত্ব এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদকে বাতিল করে বংশপরম্পরার উপর জোর দেন। তিনি মনে করতেন প্রাণী তার জীবনের অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে

সঞ্চারিত করে যায়। লিসেঙ্কো দেখালেন উন্নতজাতের গম থেকে উন্নত এবং অধিকফলনশীল কীভাবে উৎপাদন করা যায়। স্ট্যালিন কমিউনিস্ট ভাবধারার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ ট্রোফিম ডেনিশোভিচ লিসেঙ্কোর মতবাদকে চাপিয়ে দেন। জীনতত্ত্ব নিয়ে যেসব বিজ্ঞানীরা কাজ করছিলেন তাঁদেরকে জনসাধারণের কাছে লিসেঙ্কোর মতবাদকে সমর্থন এবং প্রচার করতে বাধ্য করা হয়। অন্যথায় তাদের স্থান হতো লেবার ক্যাম্পে।

Alexander Oparin lived and worked in the USSR

(Credit: Sputnik/Science Photo Library)

স্ট্যালিনের দমন নিপীড়নের শাসনের মধ্যেই আলেক্সান্ডার ওপারিন চালিয়ে যেতে লাগলেন তার জৈবরাসায়নিক গবেষণা। ওপারিন নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর কমিউনিজমের প্রতি সন্দেহাতীত আনুগত্য। ওপারিন লিসেঙ্কোর তত্ত্বকে সমর্থন দিলেন এবং দেশের সেবা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ‘অর্ডার অফ লেনিন’ সর্বোচ্চ পুরষ্কারে ভূষিত হন।

১৯২৪ সালে ওপারিন প্রকাশ করলেন 'দ্য ওরিজিন অফ লাইফ' নামক তার অমর গ্রন্থখানি। দ্য ওরিজিন অফ লাইফ বইতে ওপারিন প্রাণের বিকাশ অন্বেষণে যে প্রস্তবনা করেন সেটা ডারউইনের বিবর্তনবাদের 'একটি ছোট উষ্ণ পুকুর' ধারণার সাথে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়। ওপারিন চিন্তা কল্পনা করেছিলেন কেমন ছিল সদ্য গঠিত পৃথিবীর চেহারা। পৃথিবীর উপরিভাগ ছিল কল্পনাতীত গরম, মহাকাশ থেকে খসে পড়া জ্বলন্ত পাথরের খণ্ড। পৃথিবী তখন ছিল বিভিন্ন ধরণের বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থমিশ্রিত অর্ধগলিত পাথরের বিশৃঙ্খল স্তূপ। পদার্থগুলোর মধ্যে কার্বনের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশী।

Oceans formed once Earth had cooled down

(Credit: Richard Bizley/Science Photo Library)

যদি আমরা অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে কোয়াসারভেটিভ (জৈব রাসায়নিক দ্রবণ) পরীক্ষা করে দেখি তাহলে দেখব দ্রবণটি জীবিত কোষের মতো আচরণ করছে। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা হচ্ছে, জলীয় বাস্প ঘনীভূত হয়ে প্রথম বৃষ্টি নামল পৃথিবীর বুকে,

তরল পানিতে তলিয়ে গেল চরাচর। বৃষ্টি পড়ার আগেও সমুদ্র ছিল তবে সেটা প্রচণ্ড উত্তাপে গলিত কার্বননির্ভর ঘন তরল। এমতাবস্থায় দুইটা জিনিস ঘটতে পারে।

প্রথমত, বিভিন্ন রাসায়নিক নিজেদের মাঝে বিক্রিয়া করে অসংখ্য নতুন জটিল যৌগ সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে কিছু যৌগ আরও জটিল যৌগে পরিণত হবে। ওপারিন ধারণা করেন রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষুদ্র মৌলগুলি প্রাণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। চিনি এবং এমাইনো এসিড পৃথিবীর পানি থেকেই উৎপত্তি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কিছু রাসায়নিক দ্রব্য নতুন আণুবীক্ষণিক অণুজীবের কাঠামো তৈরি করতে শুরু করে। কিছু অণুজীবের জৈবরাসায়নিক উপাদান পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যেমন তেল পানির উপর আস্তরণ সৃষ্টি করে ভেসে থাকে। কিন্তু যখন কিছু জৈবরাসায়নিক উপাদান পানির সাথে মিশে যায় তখন গোলাকার "কোয়াসারভেটিভ" বস্তুর রূপ ধারণ করে যেগুলো আয়তনে .০১ সেমি বা (.০০৪) ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। অণুজীব বেড়ে ওঠে, তারা অবয়ব পরিবর্তন করে এমনকি মাঝেমাঝে তারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তারা চারপাশের পানির রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এভাবেই জীবনসদৃশ রাসায়নিক উপাদান নিজেদের মাঝে সংগঠিত হতে থাকে। ওপারিন প্রস্তাব করেন কোয়াসারভেটিভ হলো আধুনিক জীবিত কোষের পূর্বপুরুষ।

ওপারিনের মতবাদে দেখা যাচ্ছে জীবিত অনুজীবের জন্ম হয়েছে পুরোপুরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এখানে কোন ঈশ্বরের হাত নেই। এমনকি অলৌকিকভাবে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে এমন চিন্তাও প্রথাগত যার কোনো ভিত্তি নেই।

পাঁচ বছর পরে ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী জন বারডন স্যান্ডারসন হালডেন একই মতবাদ নিয়ে র‍্যাশনালিস্ট অ্যানুয়াল জার্নালে একটা ছোট প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। হালডেন ইতিমধ্যেই বিবর্তনবাদে প্রভূত অবদান রেখে ফেলেছেন। তিনি ডারউইনের মতবাদকে বিকাশমান জীনতত্ত্বের আলোকে আরও সংহত করে।

রঙ্গমঞ্চে হালডেন তাঁর জীবনের থেকেও বড় চরিত্র। একবার তিনি কানের পর্দায় ছিদ্রের চিকিৎসায় ডিকম্প্রেসন চেম্বারের অভিজ্ঞতার জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু পরে তিনি রম্য করে লিখেছিলেন, "কানের পর্দা সাধারণত প্রাকৃতিকভাবেই সুস্থ হয়ে যায়। যদি পর্দায় ছিদ্র থেকেই যায় এবং তার ফলে কেউ যদি বধির হয়ে যায় তাহলে সে কারো ভ্রূক্ষেপ না করেই বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে পারবে যেটা হবে একটা সামাজিক অর্জন"।

ওপারিনের মতো হালডেনও মতবাদ প্রচার করলেন, সমুদ্র প্রাথমিক অবস্থা থেকে স্থিতিশীল গরম ঘন তরলে পরিণত হলে কীভাবে সেখানের পানিতে রাসায়নিক অনুজীব নিজে থেকেই সৃষ্ট হতে পারে। পৃথিবীর এরকম পরিবেশে প্রথম জন্ম নেয় জীবনের অণুজীব অথবা অর্ধজীবন্ত বস্তু আর এরপরের স্তরে সৃষ্টি হয় স্বচ্ছ তেলতেলে জেলির মত থকথকে বস্তু।

কথিত আছে ওপারিন এবং হালডেন যে তত্ত্বের অবতারণা করেন পৃথিবীর সমস্ত জীববিজ্ঞানী সেগুলো ব্যক্ত করেন মাত্র। প্রাণের প্রথম বিকাশ ঘটেছে পুরোপুরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এখানে কোনো ঈশ্বরের হাত নেই। ডারউইনের বিবর্তনবাদের আগেও পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। ডারউইন সেটাকে যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন কিন্তু এই তত্ত্ব খ্রিস্টবাদের ভিত্তিমূলে চরম কুঠারাঘাত।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের একটাই সমস্যা ছিল। তাঁর প্রচারিত বিবর্তনবাদকে নির্ভুল প্রমাণ করতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিরিখে কোনো প্রমাণ নাই। ঈশ্বরবিহীন সৃষ্টিতত্ত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনো সমস্যা নয় কারণ কমিউনিস্ট শাসিত সোভিয়েত রাষ্ট্রীয়ভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। সেজন্যই কমিউনিস্ট নেতারা প্রাণের উৎপত্তি গবেষণায় বস্তবাদী ব্যাখ্যাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। হাল্ডেন নিজেও ছিলেন একজন নাস্তিক এবং কমিউনিজমের কড়া সমর্থক।

তখনকার সময়ে বিবর্তনবাদ গৃহীত হবে নাকি বাতিল সেটা নির্ভর করত প্রধানত ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্বের ওপর। জীবনের উৎস অনুসন্ধান করা বিশেষজ্ঞ জীববিজ্ঞানী জার্মানির ওসনাব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আরমেন মালকিদজানিয়ান বলেন, বিবর্তনবাদ গৃহীত হবে কি হবে না নির্ভর করে মানুষেরা কি ধর্মে বিশ্বাস করে নাকি বাম ধারার কমিউনিজম সমর্থন করে সেটার ওপর। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিবর্তনবাদ সাদরে গৃহীত হয়েছে কারণ সেখানে ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল না। যদি পশ্চিমাবিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব সেখানের মানুষেরা অনেক বস্তুবাদী। তাদের চিন্তা বামঘেঁষা কমিউনিস্ট বা উদারপন্থার দিকে ধাবিত।

'প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে আদিম জৈবরাসায়নিক ঘন তরল সহযোগে' এই ধারণাটি ওপারিন-হালডেন তত্ত্ব বলে ব্যাপক পরিচিত পেয়ে গেল। ওপারিন-হালডেন তত্ত্ব যুক্তির বিচারে গ্রহণযোগ্য হলেও তত্ত্বটির একটা সমস্যা ছিল। ওপারিন-হালডেন তত্ত্বকেও নির্ভুল করার স্বপক্ষে কোন গবেষণালব্ধ প্রমাণ নেই। পচিশ বছর পার হয়ে গেলেও তত্ত্বটির সপক্ষে কোনো প্রমাণ দাঁড় করানো যায়নি।

© Science Photo Library
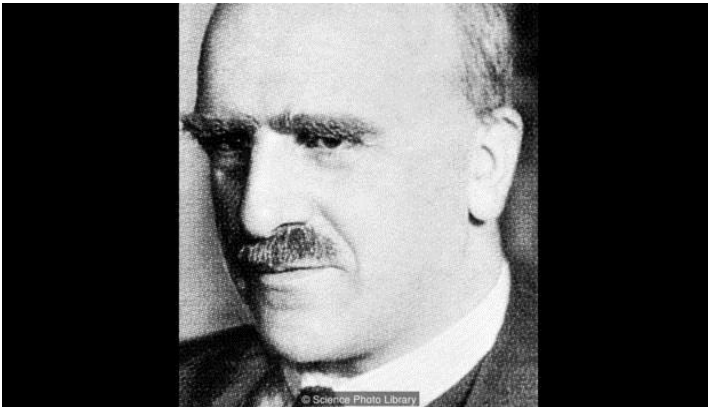
The English geneticist J. B. S. Haldane

(Credit: Science Photo Library)

সময়ের সাথে প্রাণের উদ্ভব গবেষণায় যোগ দেন ১৯৩৪ সালে রসায়নে নোবেল বিজয়ী আমেরিকান রসায়নবিদ। হ্যারল্ড উরে পারমাণবিক বোমা বানানোর দলেও কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ম্যানহাটান প্রকল্পে পারমাণবিক বোমার অতি প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম ২৩৫ সমৃদ্ধ করতেন। যুদ্ধের পরে তিনি নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিকে সুশীল সমাজের নিয়ন্ত্রণে দেয়ার জন্য আন্দোলন করেন। প্রফেসর উরে ধারণা করেছিলেন, আমাদের পৃথিবী আদিম অবস্থায় সম্ভবত অ্যামোনিয়া, মিথেন এবং হাইড্রোজেনের মিশেলে পিণ্ডাকৃতির ছিল। এই মিশ্রণকে যদি বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ এবং পানির সংস্পর্শে আনা যায় তাহলে অ্যামাইনো এসিড উৎপন্ন করা সম্ভব। এটা সর্বজন বিদিত যে, অ্যামাইনো এসিড হলো জীবনের প্রথম উপাদান।

উরে এই সময়ে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশ এবং মহাকাশের ভাসমান বস্তুকণার রসায়ন নিয়ে আগ্রহী হন বিশেষ করে দেখতে চেয়েছিলেন সৌরজগৎ যখন সবে সৃষ্টি হলো তখন ঠিক কী ঘটছিল। একদিন তিনি ক্লাসে বললেন সৃষ্টিলগ্নে পৃথিবীর বায়ুস্তরে সম্ভবত অক্সিজেনের অস্তিত্ব ছিল না। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংস্পর্শে অক্সিজেন হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে। উরের ক্লাস লেকচারের প্রস্তাবিত ‘অক্সিজেনবিহীন পৃথিবী’ ওপারিন এবং হালডেনের আদিম জৈবরাসায়নিক ঘন তরল ধারণাকে আরও বেগবান করে। প্রফেসর হ্যারল্ড উরের ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন পিএইচডি’র গবেষণারত ছাত্র স্ট্যানলি মিলার। মিলার প্রফেসর উরেকে প্রস্তাব দেন পরীক্ষা করে দেখার আসলেই কেমন ছিল সেদিনের সৌরজগতের পরিবেশ। উরে নিজের ক্লাস লেকচারের ওপর কিছুটা সন্দেহ পোষণ করলেও মিলার অক্সিজেনবিহীন পৃথিবীর চিন্তায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁদের মাঝে বিস্তর আলোচনার পরে ১৯৫২ সালে প্রফেসর উরে এবং তাঁর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্ট্যানলি লয়েড মিলার যৌথভাবে প্রথমবারের মতো প্রাণের খোঁজে বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত ‘উরে-মিলার এক্সপেরিমেন্ট’ পরীক্ষা শুরু করলেন।
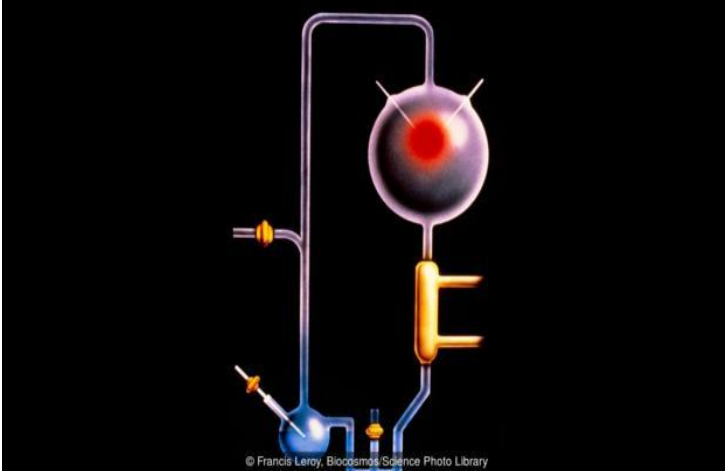
The Miller-Urey experiment

(Credit: Francis Leroy, Biocosmos/Science Photo Library)

পরীক্ষার যন্ত্রপাতি খুব সাধারণ। মিলার পূর্বের আলোচিত ধারণা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নের চারটি রাসায়নিক উপাদান গরম পানি, হাইড্রোজেন গ্যাস, অ্যামোনিয়া এবং মিথেন চারটি কাঁচের জারে পূর্ণ করে তাদের মাঝে সংযোগ করে দিলেন। কাঁচের গ্লাসের মাঝে মিলার বারবার তড়িৎপ্রবাহ দিতে লাগলেন যাতে বজ্রপাত ঘটে। আদিকালে পৃথিবীতে বজ্রপাতের ঘটনা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক। এই পরীক্ষার মাধ্যমে খুব সাধারণ পরিবেশেই প্রচুর পরিমাণ জৈব অনু উৎপাদন সম্ভব। মিলার দেখতে পেলেন প্রথমদিনেই কাঁচের জারের মধ্যকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গোলাপী আভা ধারন করেছে এবং সপ্তাহ শেষে ঘন তরল দ্রবণটি গাঢ় লাল হয়ে গেল। পরিষ্কার বোঝা গেল জারে জৈব রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ তৈরি হয়েছে।

মিলার পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে মিশ্রণটিতে গ্লাইসিন এবং আলানাইন নামে দুইটা অ্যামাইনো এসিড পেলেন। অ্যামাইনো এসিডকে জীবন সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং অ্যামাইনো এসিড আমিষ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আমিষ

আমাদের শরীরের শারীরবৃত্তিক এবং জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মিলার গবেষণাগারে জন্ম দিলেন প্রাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মিলারের গবেষণার ফলাফল বিখ্যাত সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হলো ১৯৫৩ সালে। প্রাণের বিকাশ অভিযানে 'উরে-মিলার এক্সপেরিমেন্ট' স্মরণীয় ঘটনা। উদার প্রফেসর উরে এই গবেষণার সমুদয় কৃতিত্ব মিলারকে দিয়ে আর্টিকেল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞানের গবেষক জন সাদারল্যান্ড বলেন, "উরে-মিলার পরীক্ষার শক্তি এখানেই যে, আপনি সাধারণ পরিবেশে প্রচুর অণুজীব সৃষ্টি করতে পারবেন"। জীবন আরও জটিল যা আমরা চিন্তা করি তার থেকেও বেশি।

পরবর্তীতে আরও গবেষণায় পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে অন্যান্য গ্যাসের মিশ্রণও ছিল আবিষ্কারের কারণে আগের গবেষণা ভুল প্রমানিত হয়। কিন্তু সেটা নিয়ে সম্পূরক আলোচনা হতে পারে। জন সাদারল্যান্ড বলেন, "উরে-মিলার পরীক্ষা ছিল দৃষ্টান্ত, তারা মানুষের কল্পনা জাগাতে পেরেছিলেন এবং প্রাণের উৎস সন্ধানে ব্যাপকভাবে চর্চা করতে থাকে"। মিলারের পরীক্ষার প্রভাবে অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এগিয়ে এলেন ভিন্ন ভিন্ন মৌল থেকে অনুজীব সৃষ্টির গবেষণা করে প্রাণের উৎস সন্ধানে। প্রাণের রহস্য উন্মোচনের হাতছানি মনে হয় সন্নিকটে। এতদিনে পরিষ্কার হওয়া গেছে জীবন এত জটিল যে আমাদের চিন্তাকে বিহ্বল করে দেয়। অবশেষে জানা গেল জীবন্ত কোষ শুধু কিছু রসায়নের জটিল যৌগ নয়, জীবন হলো সূক্ষ্ম শিল্পিত যন্ত্রবিশেষ। হঠাৎ করে সম্পর্কহীন বস্তু থেকে নিজেকে সৃষ্টি করে নিজেই আবার বড় বাধা অতিক্রম করে ছুটে যায় নতুন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীদের বুঝে ওঠার আগেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়
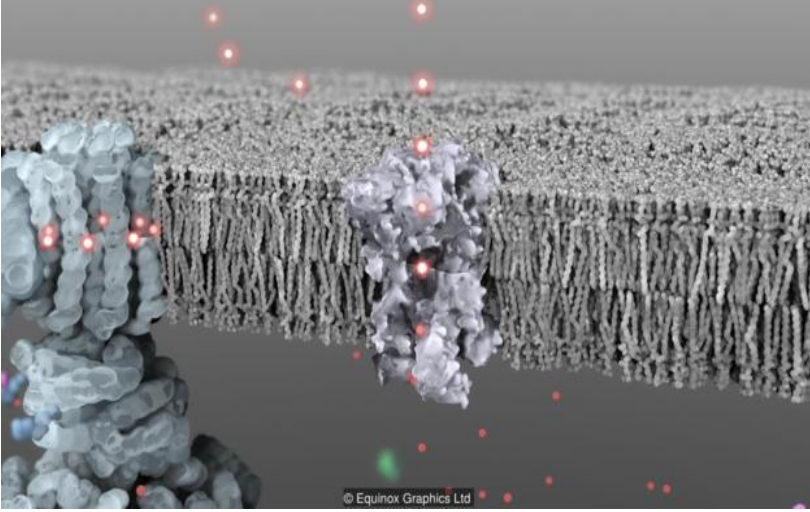
The machinery inside cells is unbelievably intricate

(Credit: Equinox Graphics Ltd)

বিজ্ঞান সভায় বিভাজন

১৯৫০ সালের শুরুর দিকে বিজ্ঞানীগণ আমাদের জীবন ঈশ্বরের দান বহুদিনের পুরানো বাসি ধারণা থেকে সরে আসতে থাকেন। তার পরিবর্তে তারা সম্ভাবনাময় জীবন কীভাবে নিজে নিজেই প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হলো সেই রহস্য উন্মোচনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এবং যুগান্তকারী পরীক্ষার জন্য অবশ্যই স্ট্যানলি মিলারকে ধন্যবাদ। বিজ্ঞানীগণ জীবন অন্বেষণে মিলারের পরীক্ষা থেকে ভবিষ্যৎ গবেষণার রশদ পেয়ে গেলেন।

মিলার যখন ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থেকে জীবনের উপাদান বানাতে ব্যস্ত তখন কিছু বিজ্ঞানী জিন কীসের তৈরি খুঁজতে গবেষণারত। ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীগণ অনেকগুলো অনুজীবকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। শর্করা, চর্বি, আমিষ, নিউক্লিক এসিড যেমন ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড বা সংক্ষেপে ডিএনএ আবিষ্কার হয়ে গেছে এতদিনে। বিশ শতক হলো আবিষ্কারের স্বর্ণযুগ। বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারগুলো এই শতাব্দীতেই ঘটেছে।

আজকে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি ডিএনএ আমাদের জিন বহন করে। কিন্তু ডিএনএ আবিষ্কার ১৯৫০ দশকের বিজ্ঞানীদের জন্য একটা আঘাত কারণ আমিষের জটিল গঠন দেখে তারা আমিষকেই জিন ভেবেছিলেন। ১৯৫২ সালে আলফ্রেড হারশে এবং মার্থা চেস বিজ্ঞানীদের ভুল ভেঙে দেন। তাঁরা ওয়াশিংটনের কার্নেজি ইনস্টিটিউটে শুধু প্রোটিন আর ডিএনএ বহনকারী ক্ষুদ্র ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করছিলেন। পুনোরুৎপাদনের জন্য ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মাঝে সংক্রামিত হয়। পরীক্ষায় আলফ্রেড হারশে এবং মার্থা চেস জানতে পারলেন সংক্রামক ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেছে কিন্তু প্রোটিন বাইরেই রয়ে গেল। পরিষ্কার বোঝা গেল, ডিএনএ হলো জীনের উপাদান।

হারশে এবং মার্থা চেস'র পরীক্ষার ফলাফল ডিএনএ কীভাবে কাজ করে এবং কেমন তার গঠন আবিষ্কারের গবেষণায় তোলপাড় সৃষ্টি করে দিলো। পরের বছর ডিএনএ রহস্যের সমাধান করে ফেললেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ফ্রান্সিস ক্রিক এবং জেমট ওয়াটসন। দীর্ঘ পরিশ্রমসাধ্য গবেষণায় তাঁদেরকে সাহায্য করেন রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন। বিশ শতকের আবিষ্কারগুলো জীবনের উৎস অন্বেষণের পথে নতুন মাত্রা যোগ করে। আবিষ্কৃত হতে থাকে জীবন্ত কোষের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা অবিশ্বাস্য জটিলতা।
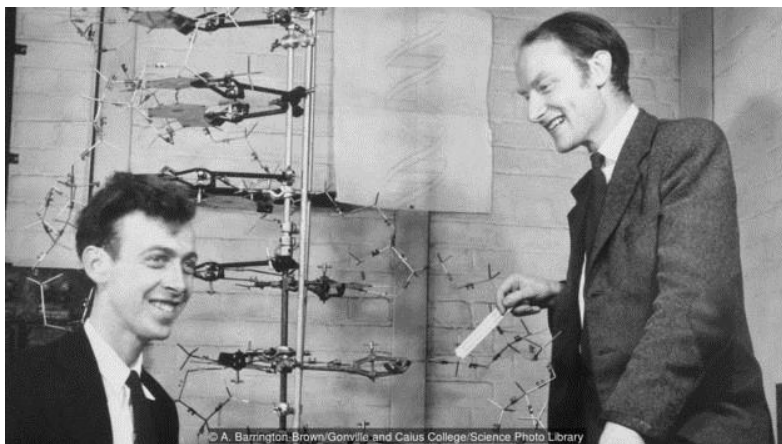
James Watson and Francis Crick with their model of DNA

(Credit: A. Barrington-Brown/Gonville and Caius College/Science Photo Library)

ক্রিক এবং ওয়াটসন বুঝতে পেরেছিলেন ডিএনএ হলো দুইটা প্যাচানো মইয়ের সদৃশ বস্তু যারা আবার নিজেদের মধ্যেও সর্পিল আকৃতিতে জড়িয়ে থাকে। প্যাচানো মইয়ের দুই প্রান্ত নিউক্লিওটাইড নামের মলিকিউল দ্বারা গঠিত। আমার আপনার এবং আমাদের সবার জীন এসেছে ব্যাকটেরিয়া নামের আদি পিতা থেকে। ডিএনএ'র গঠন ব্যাখ্যা করে কীভাবে আমাদেরকে কোষ ডিএনএকে অনুসরণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, ডিএনএ উন্মোচন করে কীভাবে বাবা-মা তাদের জীনের প্রতিলিপি তৈরি করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। এখানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো, এখন প্যাচানো দুই সর্পিল মইয়ের রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব। তখন আমরা জানতে পারি, জীবের বংশগতির ধারা যা তৈরি হয়েছে জীবের বংশপরম্পরায়; বংশগতির ধারাকে আমরা এ, টি সি এবং জি দিয়ে চিহ্নিত করতে পারি। বংশগতির ভিত্তি সাধারণত ডিএনএ'র সর্পিল মইয়ের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং প্রতিলিপি তৈরির প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

এই একই প্রক্রিয়ায় বংশগতি জীবনের শুরু থেকেই বাবা-মা তাদের সন্তানদের মাঝে জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রবাহিত করতে থাকে। ক্রিক এবং ওয়াটসন আবিষ্কার করেন

ব্যাকটেরিয়া থেকে কীভাবে ধাপে ধাপে বংশগতির প্রতিলিপি তৈরি করে প্রাণী আজকের অবস্থানে চলে এসেছে।

ক্রিক এবং ওয়াটসন ১৯৫৩ সালে তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান 'নেচার' বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশ করেন। ক্রিক এবং ওয়াটসনের আবিষ্কারের ফলে পরের বছরগুলোতে জৈবরাসায়নিক বিজ্ঞানীগণ ডিএনএ ঠিক কী তথ্য বহন করে সেটার আদ্যপান্ত খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা দেখতে চাইলেন কীভাবে DNA তে সংরক্ষিত তথ্য জীবন্ত কোষে ব্যবহৃত হয়। জীবনের অভ্যন্তরে লুকায়িত গোপন খবর প্রথমবারের মত প্রকাশের পথে। তখন হঠাৎ করে বিজ্ঞানীদের কাছে ওপারিনের ধারণাকে মামুলি সাদাসিধা।

আবিষ্কার হয়ে গেল DNA'র মাত্র একটাই কাজ। আপনার ডিএনএ আপনার কোষদেরকে বলে দেয় কীভাবে প্রোটিন তৈরি করতে হবে। প্রোটিন সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে মলিকিউল। প্রোটিন ছাড়া আপনি খাদ্য হজম করতে পারবেন না, আপনার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি নিশ্বাস নিতে পারবেন না।

DNA থেকে প্রোটিন উৎপন্নের জটিল প্রক্রিয়া দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। যে কারো পক্ষে জীবনের উৎস কী ব্যাখ্যা করতে যাওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ল কারণ এত জটিল প্রক্রিয়া কীভাবে একা একা শুরু হয়েছিল সেটা বিজ্ঞানীগণের চিন্তার জন্যও দুরূহ। প্রতিটি প্রোটিনই মূলত অ্যামাইনো এসিডের বিশাল শিকল একটা বিশেষ শৃঙ্খলার বাঁধনে তারা পারস্পারিক আবদ্ধ। অ্যামাইনো এসিডের ক্রম নির্ধারণ করে দেয় প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক আকার এবং এভাবেই প্রোটিন কাজ করে। সর্পিল DNA'র অভ্যন্তরে প্রাণের প্রয়োজনীয় তথ্য সাংকেতিক আকারে লিপিবদ্ধ থাকে। সুতরাং যখন একটা কোষকে কোন নির্দিষ্ট প্রোটিন সৃষ্টি করতে হয় তখন সে অ্যামাইনো এসিডের শিকলের নাগাল পেতে DNA'র মধ্যে সংরক্ষিত জীন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণ করতে শুরু করে।

কিন্তু এখানেও একটা প্যাঁচ আছে। DNA জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই কোষ DNA কে সংরক্ষণ করতে নিরাপদে জমিয়ে রাখে। এই কারণে কোষ DNA'র তথ্যকে প্রতিলিপি করে RNA (রাইবোনিউক্লিক এসিড) মলিকিউলে স্থানান্তর করে। DNA যদি পাঠাগারের বই ধরি তাহলে RNA হবে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ লেখা ছেঁড়া কাগজের সমষ্টি। DNA'র তুলনায় RNA ছোট। সর্পিল মইতে RNA'র একটামাত্র সুতোর মতো প্রান্ত। এপর্যায়ে RNA'র মধ্যে সংরক্ষিত তথ্য প্রোটিনে পরিণত হয় এবং প্রচুর পরিমাণ 'রাইবোসোম' মলিকিউল গঠন করে।

প্রতিটি জীবিত কোষে এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এমনকি অতি সাধারণ ব্যাকটেরিয়াও এই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। খাদ্যগ্রহণ এবং অবিরাম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যাওয়া জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণের উৎস ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই DNA, RNA, রাইবোসোম এই তিন প্রোটিনের জটিল মিথস্ক্রিয়া বুঝতে হবে। কীভাবে তাদের উৎপত্তি হলো, কেমন করেই বা তারা পরস্পর কাজ শুরু করে।

© Russell Kightley/Science Photo Library

Cells can become enormously intricate

(Credit: Russell Kightley/Science Photo Library)

হঠাৎ করেই ওপারিন এবং হালডেনের ধারণা নিতান্ত সাদামাটা প্রতীয়মান হয়ে গেল। একই সাথে মিলারের যে যুগান্তকারী পরীক্ষার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছিল অ্যামাইনো এসিড যা দিয়ে প্রোটিন সৃষ্টি সম্ভব সেটাকেও মনে হলো অসম্পূর্ণ এবং ভাসাভাসা। কীভাবে জীবন সৃষ্টি হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর থেকে এখনো আমরা অনেক দূরে। মিলারের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ছিল সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনের দীর্ঘ যাত্রাপথের সূচনামাত্র। জীবন গঠিত হয়েছিল RNA দিয়ে এই ধারণা এখন প্রভূত প্রমাণিত এবং বিজ্ঞানে খুব প্রভাবশালী তত্ত্ব।

জন সাদারল্যান্ড বলেন, “DNA সৃষ্টি করে RNA এবং RNA সৃষ্টি করে প্রোটিন যা লিপিড হিসেবে মুখ আটকানো রসায়নের থলের মধ্যে থাকে। আপনি যদি DNA, RNA এবং লিপিডের দিকে তাকাই তাহলে এর জটিলতা দেখে বিস্ময়ে আপনার মুখ হা হয়ে যাবে। কীভাবে আমরা খুঁজে পাবো!

অন্যান্য বিজ্ঞানীগণকে যদি ধরি প্রাণের উৎস গবেষণার রাস্তা তৈরি করেছেন তাহলে ব্রিটিশ রসায়নবিদ লেজলি ওরগেলকে বলতে হবে প্রথম বিজ্ঞানী যিনি সেই রাস্তায় যাত্রা শুরু করেন। লেজলি ওরগেলই প্রথম ক্রিক এবং ওয়াটসনের DNA’র মডেল নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরে তিনি মঙ্গলগ্রহে রোবটিক যান পাঠাতে নাসা’র ভাইকিং প্রোগ্রামে সাহায্য করেছিলেন। ওরগেল প্রাণের উৎস কী এই বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসাকে চিহ্নিত করলেন। ১৯৬৮ সালে লিখিত এক গবেষণাপত্রে তিনি দাবি করেন জীবনের শুরুতে প্রোটিন বা DNA কিছুই ছিল না। জীবন সৃষ্টি হয়েছিল পুরোপুরি RNA দিয়ে এবং ফ্রান্সিস ক্রিক ওরগেলের এই দাবীকে সমর্থন দেন।

ওরগেলের দাবী যদি সঠিক হয় তাহলে আদিম RNA মলিকিউলকে অবশ্যই অভিযোজন ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তারা নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করবে। ধারণা করা হচ্ছে সম্ভবত DNA একই প্রক্রিয়ায় কাজ করে।

জীবন গঠিত হয়েছিল RNA দিয়ে এই ধারণা এখন প্রভূত প্রমাণিত হয়েছে এবং বিজ্ঞানে খুব প্রভাবশালী তত্ত্ব। কিন্তু জন্ম দিয়েছে বৈজ্ঞানিক তর্কযুদ্ধের যা আজ অবধি চলছে।

জীবন শুরু হয়েছিল RNA দিয়ে দাবী করেই ওরগেল ক্ষান্ত হননি, তিনিই সবার আগে প্রস্তাব করেন RNA নিজেকে নিজেই পুনরুৎপাদন করতে পারে যা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অন্যভাবে বলা যায় তিনি শুধু জীবন কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল সেটাই বলেননি, জীবন কী এই প্রশ্নেরই সমাধান তিনি করে ফেলেছেন। এ পর্যায়ে বিজ্ঞানীগন প্রাণের জন্ম রহস্য নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেলেন।
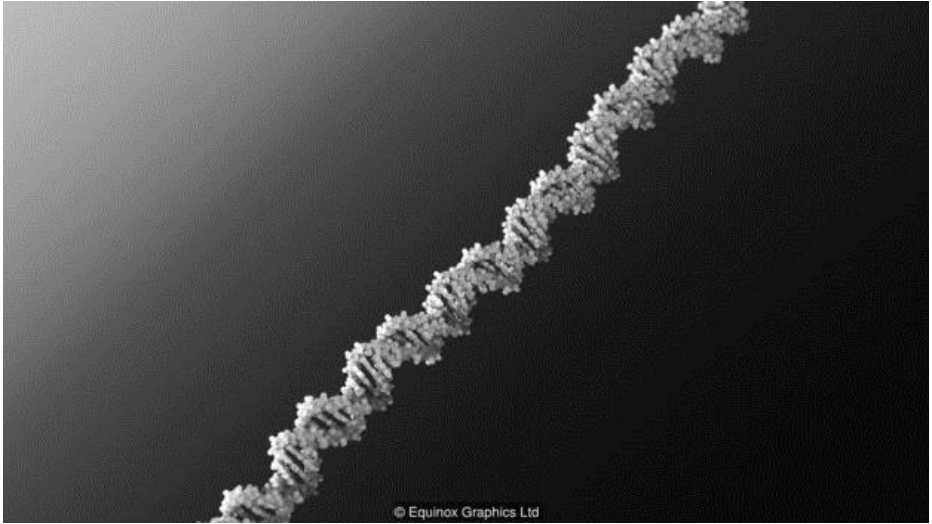
DNA is at the heart of almost every living thing

(Credit: Equinox Graphics Ltd)

অনেক জীববিজ্ঞানী ওরগেলের ‘প্রাণ নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করে’ দাবীর সাথে সহমত পোষণ করলেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদের সারাংশ ছিল নিজের অসংখ্য প্রতিলিপি বা সন্তান জন্মদানের মাধ্যমেই শুধু প্রাণী নিজের বংশ রক্ষা করতে পারে। কিন্তু জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো যেমন জীবন

বেঁচে থাকার জন্য একটি জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ঘটতে থাকা রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বেঁচে থাকতে হলে চারিপাশের পরিবেশ থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। অনেক জীববিজ্ঞানী মনে করেন জীবনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো জীবনের অভ্যন্তরীণ চলমান রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং জীবের নিজের প্রতিলিপি উদ্ভব হয়েছে অনেক পরে। এখানেই বিতর্কের শুরু। ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ জীবনের উত্থান গবেষণায় দুই সালে বিভক্ত। সাদারল্যান্ড বলেন, "জীবনের অভ্যন্তরীণ চলমান রাসায়নিক প্রক্রিয়া নাকি বংশগতি প্রথম" এই প্রশ্নই বিজ্ঞানীগণের নতুন দুই প্রান্তে বিভাজন। তাই বিজ্ঞান সভা মাঝে মাঝেই দ্বিধা বিভাজনের তর্কে পর্যবসিত হয়। ততদিনে তৃতীয় একদল বিজ্ঞানী প্রচার করলেন প্রথমে মলিকিউলের ধারকের জন্ম হয়েছে কারণ তারা ছিল তখন ভাসমান। জীবন সৃষ্টিতে কোষের উপাদানগুলোকে জড়ো করতে হয়েছে। কোষের উপাদানগুলো ছাড়া অভ্যন্তরীণ চলমান রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব নয়। সাদারল্যান্ড বলেন, প্রাণ সৃষ্টিতে কোষের প্রয়োজন যে কথা ওপারিন এবং হালডেন কয়েক দশক আগেই জোরালোভাবে বলে গেছেন। সম্ভবত জীবনের প্রথম কোষ চর্বি জাতীয় স্বচ্ছ তরল পর্দায় আবৃত ছিল।

জীবন বিকাশের এই তিনটা গবেষণা এবং তর্কালোচনার সপক্ষে বিপক্ষে অনেক বিজ্ঞানী আছেন এবং অদ্যাবধি আলোচনা চলছে। বিজ্ঞানীগণ নিজেদের ধারণার সপক্ষে নিরন্তর গবেষণা করেছেন এমনকি অনেক সময় অন্ধভাবে সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করছে। প্রায়ই দেখা যায় একদন বিজ্ঞানী আত্মপক্ষ সমর্থন করে অন্য বিজ্ঞানীগণকে নির্বোধ বলতেও দ্বিধা করছে না। ফলে জীবনের উৎস নিয়ে বিজ্ঞান সভার বিতর্ক সাংবাদিকদের পত্রিকার চটকদার কলাম আর সাধারণ পাঠকদের মুখরোচক গল্পে পরিণত হয়েছে। তারপরেও ওরগেলকে ধন্যবাদ, কেননা তিনিই প্রথম ধারণা দিলেন বংশগতি নয় বরং জীবন গঠিত হয়েছিল RNA দিয়ে। তারপর এলো ১৯৮০ দশক, বিজ্ঞানের চমক লাগানো আবিষ্কারের যুগ এবং পাওয়া হওয়া গেল কীভাবে জীবনের জন্ম প্রশ্নের অমীমাংসিত উত্তর।

তৃতীয় অধ্যায়
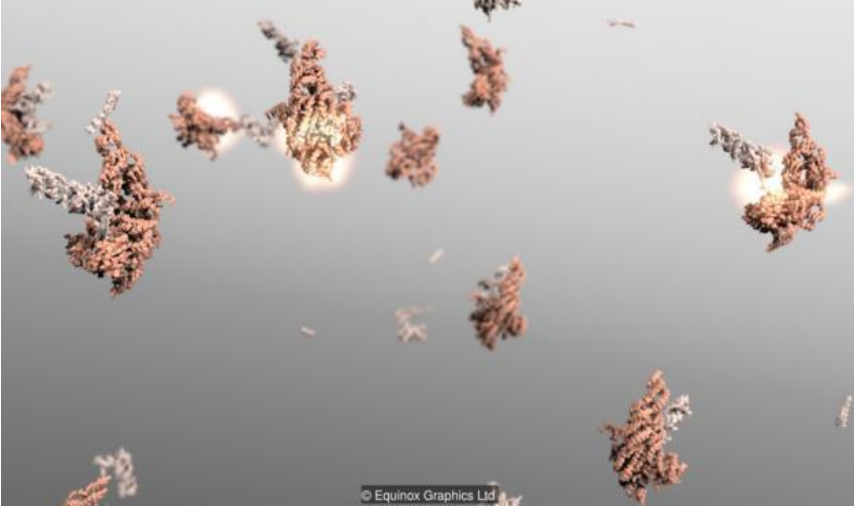
RNA could be the key to life's beginning

(Credit: Equinox Graphics Ltd)

প্রথম বংশবিস্তারকারীর খোঁজে

১৯৬০ সালের পরে বিজ্ঞানীগণ প্রাণের উৎস অনুসন্ধানে তিনটি মতবাদে বিভক্ত হয়ে গেলেন। কারো ধারণা জীবন শুরু হয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ের জৈবিক কোষ গঠনের মাধ্যমে। অন্য একদল বিজ্ঞানী মনে করেন জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল রাসায়নিক বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু আরেক দল বিজ্ঞানী বংশগতি এবং আপন কোষের প্রতিলিপি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শেষ দলের বিজ্ঞানীগণ, যে কোষটি নিজেই নিজের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারে তাদের স্বরূপ কেমন ছিল সেটা অন্বেষণের

চেষ্টা করেন। এই বিজ্ঞানীগণ প্রথম থেকেই জোর দিয়ে প্রচার করেন জীব-কোষ আরএনএ দিয়ে তৈরি।

১৯৬০ দশকের বিজ্ঞানীগণের চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে আরএনএ হলো সকল প্রাণের উৎস। বিশেষত আরএনএ এমনকিছু করতে পারে যেটা ডিএনএ করতে পারে না। আরএনএ হল একটা নমনীয় সুতো সদৃশ মলিকিউল। অন্যদিকে ডিএনএ হলো দুইটা সুতো যারা নিজেরা পেঁচিয়ে স্তরে স্তরে বিভিন্ন আকারে সাজানো থাকে। আপনি এনজাইম ছাড়া বাঁচতে পারবেন না। আরএনএ'র ভিতরে কাগজের মতো ভাঁজ করা একটা বস্তু দেখা গেল যেটা প্রোটিনের মত আচরণ করে। প্রোটিন দেখতে সাধারণত অনেকটা লম্বা সুতোর মতো। প্রোটিন নিউক্লিওটাইড নয় বরং অ্যামাইনো এসিড দিয়ে তৈরি এবং তারা বিশদ জটিল অবয়ব সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আরএনএ হলো প্রোটিন উৎপাদনের সবচেয়ে আশ্চর্য দক্ষতা। কিছু আরএনএ রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে অনুঘটকের কাজ করে। এই সমস্ত প্রোটিনকেই এনজাইম বলে।

আপনার মেরুদণ্ডের হাড়ের মজ্জায় বিপুল পরিমাণ এনজাইম বিদ্যমান। এনজাইম খাদ্যের জটিল মলিকিউলকে ভেঙে শর্করা বা চিনিজাতীয় সাধারণ সরল খাদ্য উপাদানে পরিণত করে যাতে প্রাণীর দেহকোষ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

লেজলি ওরগেল এবং ফ্রান্সিস ক্রিক'র মনে হচ্ছিল যদি আরএনএ প্রোটিনের মতো ভাঁজে ভাঁজে থাকে তাহলে আরএনএ'র মধ্যে জীবন্ত মলিকিউল থাকার সম্ভাবনা আছে এবং সেখানে তথ্যগুলো ডিএনএ আকারে সংরক্ষিত থাকে আর কিছু প্রোটিন রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। লেজলি ওরগেল এবং ফ্রান্সিস ক্রিক'র সন্দেহ ছিল নিছক ধারণা কিন্তু দশক ধরে সেই ধারণার কোনো সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি।

Thomas Cech in 2007

(Credit: Douglas A. Lockard, CC by 3.0)

টমাস রবার্ট চেক জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকার আইওয়া শহরে এবং সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা। শিশুকাল থেকেই চেক পাথর এবং খনিজ উপাদানের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ অনুভব করেন। তিনি যখন নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র তখনই স্থানীয় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের গবেষণাগারের দরজায় উঁকি দিয়ে শিক্ষকদের কাছে খনিজ উপাদানের গঠন প্রণালী দেখতে চেয়েছিলেন। টমাস রবার্ট চেক জৈব রসায়নবিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আজীবন বয়ে বেড়িয়েছেন এবং তাঁর আগ্রহের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল আরএনএ। এখন দেখা যাচ্ছে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল আরএনএ দিয়ে এবং এতদিনের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রায় দ্বারপ্রান্তে।

১৯৮০ সালের শুরুর দিকে টমাস রবার্ট চেক এবং তাঁর কিছু সহকর্মী কোলারাডো বোলডার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে এককোষী প্রাণ 'Tetrahymena thermophila' নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এককোষী প্রাণের অনুষঙ্গের সুতা সদৃশ বস্তুটি আরএনএ দিয়ে গঠিত। চেক আবিষ্কার করলেন আরএনএ'র একটা বিশেষ অংশ কখনো কখনো মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে যেন তাকে কাঁচি দিয়ে কেটে

আলাদা করে ফেলা হয়েছে। চেকের গবেষকদল যখন সব এনজাইমকে পৃথক করে ফেললেন তখন অন্যান্য মলিকিউল কাঁচির মতো কাটাকুটির কাজ করছিল। এই কাজটি চালিয়ে নিচ্ছিল আরএনএ। তারা খুঁজে পেলেন প্রথম আরএনএ এনজাইম। আরএনএ'র ক্ষুদ্র অংশ যারা নিজেদেরকে বৃহৎ অংশ থেকে দ্বিখণ্ডিত করতে সক্ষম।

চেক তাঁর গবেষণামূলক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন ১৯৮২ সালে। পরের বছর অন্য একটি বিজ্ঞানীদল রাইবোজম নামের দ্বিতীয় আরেকটি আরএনএ এনজাইমের সন্ধান পেলেন। দুইটি আরএনএ পাওয়ার সফলতার দ্রুত ইঙ্গিত দিলো সেখানে আরও অনেক কিছুর অস্তিত্ব আছে। এই আবিষ্কারের ফলে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল জীবন সৃষ্টি হয়েছিল আরএনএ থেকে।

ম্যাসাচুচেটস প্রদেশের কেমব্রিজের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ওয়াল্টার গিলবার্ট প্রথম মানুষের বংশগতি ধারণার গোড়াপত্তন করেন। পদার্থবিজ্ঞানী হলেও গিলবার্ট মলিকিউলার বায়োলজিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মানুষের জীনের ক্রমবিবর্তনের ধারা প্রমাণ করতে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। বিচ্ছিন্ন বস্তুকণা থেকে আরএনএ জগতে উত্তরণ হলো প্রাণের বিকাশে রাজকীয় যাত্রার শুরু। ১৯৮৬ সালে 'নেচার' বিজ্ঞান সাময়িকীতে গিলবার্ট প্রস্তাব করেন প্রাণের উৎপত্তি হয়ে আরএনএ'র হাত ধরে।

গিলবার্ট যুক্তি দেখান বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে নিউক্লিওটাইড ঘনতরল থেকে বস্তুকণা থেকে নিজেই নিজের প্রাণ সৃষ্টির কাজকে ত্বরান্বিত করে আরএনএ মলিকিউল। আরএনএ সম্মিলিতভাবে দ্বিভাজিত হয় এবং নিজের স্বরূপ সৃষ্টি করে। আরএনএ মলিকিউল ক্রমান্বয়ে অনেক প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্ম দিল। আরএনএ খুঁজে পেল প্রোটিন এবং প্রোটিন এনজাইম সৃষ্টির উপায় এবং প্রমাণিত হলো তাদের গুরুত্ব এবং তারা যাত্রা শুরু করলো জীবনের পথে যে জীবন আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রাণের বিকাশ প্রথম দিকের নিউক্লিওটাইড আদিম ঘনতরল

স্যুপ থেকে একাধিক জৈবরাসায়নিক অণুজীবের গঠনের উপর যুগপৎ নির্ভর করেনি বরং একটা বিশেষ অণুজীব প্রাণ সৃষ্টির সর্বকাজের কাজি। ২০০০ সালে আরএনএ তত্ত্বের সমর্থনে এক নাটকীয় প্রমাণ পাওয়া গেল।
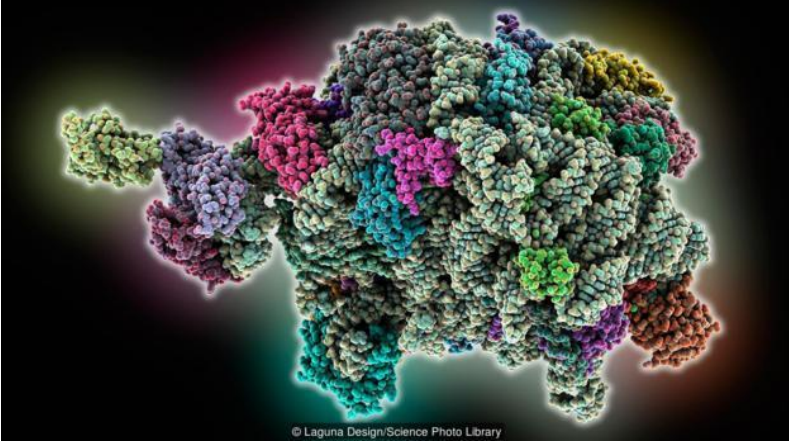
The ribosome makes proteins

(Credit: Laguna Design/Science Photo Library)

যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবরসায়নের অধ্যাপক টমাস আর্থার স্টিৎজ সুদীর্ঘ ৩০ বছর ধরে জীবন্ত কোষে অণুজীবের গঠন নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। ১৯৯০ সালে তিনি রাইবোজোমের গঠনপ্রণালী খুঁজে দেখার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলেন। প্রকৃত ঘটনা হলো প্রাণের প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম আরএনএ নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এবং আরএনএ-কেন্দ্রিক প্রাণের বিকাশ বেশি গ্রহণযোগ্য।

প্রতিটি জীবন্ত কোষে রাইবোজোম আছে। রাইবোজোম আরএনএ থেকে সংকেত গ্রহণ করতে পারে এবং আরএনএ'র অভ্যন্তরীণ সুতোর মতো জালিকা অ্যামাইনো এসিড একত্র করে প্রোটিন সৃষ্টি করতে পারে। প্রাণীদেহের বেশিরভাগ কোষ রাইবোজোম দ্বারা গঠিত। রাইবোজোম কোষের আরএনএ বহনকারী হিসেবে পরিচিত। ২০০০ সালে অধ্যাপক স্টিৎজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদল

রাইবোজোমের গঠনের বিশদ চিত্র খুঁজে পেলেন এবং আবিষ্কার করলেন রাইবোজোমের অন্তঃস্থলে অনুঘটকের কাজ করছে আরএনএ।

ভাবতেই কেমন জটিল লাগছে, তাই না? কারণ রাইবোজোম হলো জীবনের ভিত্তিমূল এবং একই সাথে প্রাচীন। যেসব বিজ্ঞানীগণ সমর্থন করতেন প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে আরএন থেকে তাদের আনন্দের আর সীমা নাই। এই অসামান্য আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে অধ্যাপক টমাস আর্থার স্টিৎজ রসায়নে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন। কিন্তু সমস্যা ঘটে যায় অন্যত্র। এই আবিষ্কারের ফলে প্রাণ সৃষ্টির রহস্য আবার পিছনের দিকের সেই তিনটি ধারণার মধ্যে সন্দেহ ঘনীভূত হলো। আসলেই কী দিয়ে প্রাণ সৃষ্টি, কীভাবে সৃষ্টি? আরএনএ থেকে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল এই মতবাদের শুরুতেই দুইটা সমস্যা বিদ্যমান ছিল। আরএনএ কী প্রকৃতপক্ষে নিজে নিজেই প্রাণের সবধরনের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম? পৃথিবীর প্রথম-যুগে কী প্রথমেই আরএনএ সৃষ্টি হয়েছিল?

বিজ্ঞানীগণ তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে গবেষণাগারে নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা আরএনএ সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন। ৩০ বছরের দীর্ঘ গবেষণার পরেও গিলবার্ট প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে আরএনএ দিয়ে এই মতবাদের সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারলেন না। গিলবার্ট পেলেন অণুজীব কিন্তু সেটা প্রাণের সৃষ্টি রহস্য সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। যদি প্রাণ সৃষ্টি হয় আরএনএ অণুজীব দিয়ে তাহলে আরএনএ অবশ্যই নিজেই নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারবে। আরএনএ’কে হতে হবে স্বয়ম্ভূ।

কিন্তু আরএনএ নিজেই নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে না। ডিএনএ’র দ্বারাও একাজ সম্ভব নয়। আরএনএ বা ডিএনএ যাকিছুই বলি না কেন নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে হলে তাদের দরকার বিপুল পরিমাণ এনজাইম এবং অন্যান্য অণুজীব। ১৯৮০ দশকের শেষ দিকে কিছু জীববিজ্ঞানী প্রাণ বিকাশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়

এমন কিছু অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সমাধান করতে গবেষণা শুরু করেন। তাঁদের মতবাদের সমর্থনে তাঁরা নেমে পড়লেন, নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে এমন আরএনএ'র সন্ধানে।

Jack Szostak

(Credit: Detlev van Ravenswaay/Science Photo Library)

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের জীনতত্ত্বের প্রফেসর জ্যাক ইউলিয়াম সোসটাক প্রাণের উৎস সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। শিশুকাল থেকেই তিনি রসায়নের প্রতি এত মুগ্ধ ছিলেন যে তার বাড়ির বেইজমেন্টে তাঁর নিজস্ব একটা গবেষণাগার ছিল। তার নিজের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়লেও তিনি একবার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটান। ফলাফলে যা ঘটেছিল তা ছিল বিস্ময়কর। বিস্ফোরণের ফলে একটা গ্লাসের টিউব তীব্র-বেগে ছুটে গিয়ে ছাদের দেয়ালে গেঁথে গিয়েছিল। **১৯৮০** দশকের শুরুতে সোসটাক প্রমাণ করে দেখাতে সক্ষম হন কীভাবে জিন বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। তাঁর এই গবেষণার ফলাফল তার জন্য নোবেল পুরষ্কার এনে দিয়েছিল। তিনি দেখান আরএনএ এনজাইম কতটা শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু তিনি অতি দ্রুতই টমাস রবার্ট চেক'র আরএনএ এনজাইমের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। সোসটাক বলেন, "আমি মনে করেছিলাম এনজাইম নিয়ে

গবেষণা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। মোটের উপর সম্ভবত আরএনএ নিজেই নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে।”

১৯৮৮ সালে চেক এক বিশেষ ধরণের আরএনএ ইনজাইমের সন্ধান পেলেন যারা ক্ষুদ্র আরএনএ মলিকিউল বানাতে পারে এবং এই আরএনএ ১০ নিউক্লিওটাইডের সমান দীর্ঘ। সোসটাক গবেষণাগারে নতুন ধরণের আরএনএ ইনজাইম সৃষ্টি করে তাঁর আবিষ্কারকে সমৃদ্ধ করতে গবেষণা শুরু করলেন। সোসটাকের গবেষকদল বিপুল পরিমাণ গবেষণার ফলাফল দৈব-চয়ন পদ্ধতিতে আবার পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন কোন ধরণের এনজাইম অনুঘটকের কাজ করে। সেই পরীক্ষাগুলো থেকে আবার পরীক্ষা করলেন। একই পদ্ধতিতে ১০ বার পরীক্ষার পর সোসটাক এমন এক আরএনএ এনজাইম সৃষ্টি করলেন যার বিক্রিয়ার অনুঘটক ক্ষমতা সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনায় ৭০লক্ষ গুণ বেশি গতিশীল। তারা দেখালেন আরএনএ এনজাইম প্রকৃত অর্থেই প্রভূত শক্তিশালী কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের আরেকটি অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারে না। এমনকি অনুরূপ সৃষ্টির ধারে কাছেও যায় না। সোসটাক যেন অসম্ভবের দেয়ালে আঘাত করলেন।

RNA may not be up to the job of starting life

(Credit: Science Photo Library/Alamy)

তারপরে সবচেয়ে বড় সাফল্য এলো ২০০১ সালে অধ্যাপক সোসটাক'র সাবেক শিক্ষার্থী কেমব্রিজের ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড বারটেল'র হাত ধরে। বারটেল আর১৮ নামে আরএনএ এনজাইম সৃষ্টি করলেন যা বিদ্যমান আরএনএ জালের সাথে নতুন নিউক্লিওটাইড যোগ করতে পারে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে এই সাফল্য শুধু আরএনএ'র সাথে যথেচ্ছ নিউক্লিওটাইড সংযুক্তিই নয় বরং পূর্বের পরীক্ষার ফলাফলের যথাযথ প্রতিফলন।

এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের যা কিছু অর্জন তার কিছুই নিজেই নিজের অবিকল কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু অগ্রগতি প্রায় উদ্দেশ্যের কাছাকাছি চলে এসেছে। আরএনএ ১৮৯টি নিউক্লিওটাইড সুতোর জাল দিয়ে গঠিত এবং এটা নির্ভরযোগ্য-ভাবে আরও ১১টি নিউক্লিওটাইড আগের আরএনএ সুতোর জালের সাথে যুক্ত করতে পারে যা নিজের দৈর্ঘ্যের প্রায় ৬ শতাংশ। নতুন গবেষণা আশা জাগালো জালের কিছু সুতোর প্রান্ত ১৮৯টি নিউক্লিওটাইডের সমান দীর্ঘ। তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেল প্রাণের সৃষ্টি আরএনএ থেকে সূত্রপাত হয়নি।

২০১১ সালে কেমব্রিজের মলিকিউলার বায়োলজি বিভাগে গবেষণাগারে সবচেয়ে সফল পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন ফিলিপ হোলিগার। তাঁর গবেষকদল আর১৮ আরএনএ'র উন্নতি সাধন করেন তার নাম দিলেন টিসি১৯জেড। এই নতুন আরএনএ যেটা নিজেদের ফলাফলের নিউক্লিওটাইড ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রতিলিপি করতে পারে। তাদের ৪৮ শতাংশ নিজেদের দৈর্ঘ্য যা আর১৮ আরএনএ থেকেও বড় কিন্তু ১০০ শতাংশ সেখানে অত্যাবশ্যকীয় নয়। ক্যালিফোর্নিয়াতে লা জোলা'তে অবস্থিত 'স্ক্রিপস রিসার্চ ইন্সটিটিউটে' বিকল্প আর একটা গবেষণা তখন চলছিল জেরাল্ড ফ্রান্সিস জয়েস এবং ট্রেসি লিংকন'র নেতৃত্বে। ২০০৯ সালে তাঁরা আর একধরণের এনজাইমের সন্ধান পেলেন যারা নিজেদের অগোচরেই নিজেদেরকে অবিকল প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে। নতুন সৃষ্ট এনজাইম দুইটা ক্ষুদ্র আরএনএ'র সাথে যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় আরেকটা এনজাইমের জন্ম দেয়। এই এনজাইম আর দুইটা

আরএনএ'র সাথে যুক্ত হয়ে আবার নতুন এনজাইম সৃষ্টি করে। প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এনজাইম সৃষ্টির এই সরল চক্র অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতেই থাকে। কিন্তু এনজাইম শুধু তখনই সফলভাবে কাজ করতে পারে যখন তাদেরকে সঠিক আরএনএ সূত্র দেয়া হয়। ঠিক এই পরীক্ষাটাই জেরাল্ড ফ্রান্সিস জয়েস এবং ট্রেসি লিংকন গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেন।

অনেক বিজ্ঞানী প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে আরএনএ থেকে, এমন তত্ত্বে সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন কারণ আরএনএ নিজেই নিজের আর একটা অবিকল প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে না এবং এটাই এই তত্ত্বের প্রধান দুর্বলতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আরএনএ থেকে জীবনের সূচনা হয়নি। সম্ভবত নবগঠিত পৃথিবীতে অন্য কোনো ধরণের জৈব-কণার উপস্থিতি ছিল সেখান থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে আরএনএ থেকে তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে যখন রসায়নবিজ্ঞানগণ পারস্পারিক সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু থেকে আরএনএ উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়। ডিএনএ'র তুলনায় অণুজীবকে মনে হলো অনেক সাধারণ কিন্তু আরএনএ সৃষ্টি করা ভীষণ কঠিন এবং শ্রমসাধ্য কাজ। সমস্যা দেখা দিলো কোষের শর্করা উৎপাদন করতে গিয়ে এবং যার উপর ভিত্তি করে নিউক্লিওটাইড সৃষ্টি হয় সেখানে বিস্তর ঝামেলা। কোষের এই দুইটা অপরিহার্য উপাদান আলাদা আলাদা উৎপাদন করা সম্ভব কিন্তু এই দুইটা উপাদানের মাঝে কোন ভাবেই সংযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই সমস্যা ১৯৯০ দশকের শুরুতেই পরিষ্কার জানা গিয়েছিল সুতরাং অনেক বিজ্ঞানীই নাকসিটকিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে আরএনএ থেকে এই তত্ত্ব শুধুই নিরেট ধারণা মাত্র, বাস্তবের সাথে লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। তত্ত্বটা মোটেও সঠিক নয়।

সম্ভবত নবগঠিত পৃথিবীতে অন্যকোন ধরণের জৈব-কণার উপস্থিতি ছিল যারা আরএনএ থেকে সরল এবং যারা পৃথিবীর আদিম জৈব-কণা ভর্তি ঘন তরল থেকে

নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পারে এবং নিজেদের অবিকল প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে শুরু করে এবং আরএনএ, ডিএনএ এবং অন্যান্য উপাদান সৃষ্টির দিকে ধাবিত করে।
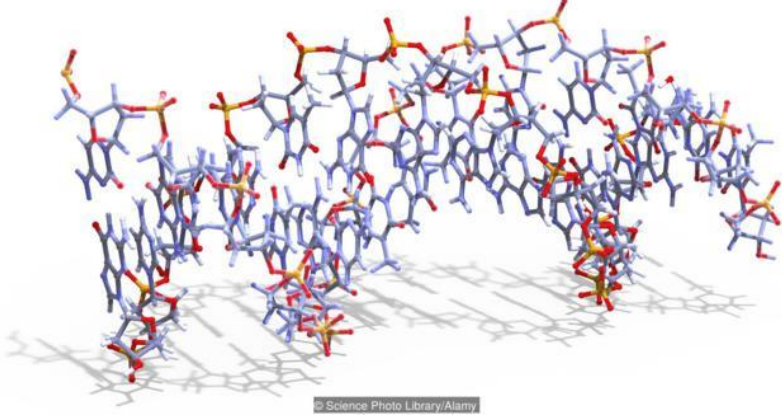
DNA may have struggled to form on the early Earth

(Credit: Science Photo Library/Alamy)

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পিটার নিলসেন ১৯৯১ সালে দাবী করলেন জীবনের সূচনা সেই আদিম পুকুরের ঘন তরল থেকে। যেখানে অণুজীব নিজের প্রতিলিপি নিজেই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এটা ছিল বিস্তর বিবর্তিত ডিএনএ। পিটার নিলসেন পূর্বের বিজ্ঞানীদের গবেষণার উপর ভিত্তি করেই এগিয়ে গেলেন নতুন উদ্যমে এবং স্থির থাকলেন ডিএনএ'র মধ্যে প্রাপ্ত এ, টি, সি এবং জি এনজাইমে। নিলসেন অণুজীব গবেষণার মূল ভিত্তি গড়ে দিলেন এবং ডিএনএ'র ভিতরে শর্করার পরিবর্তে পলিএমাইডস অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান পেলেন। তিনি নতুন প্রাপ্ত অণুজীবের নাম দিলেন পলিএমাইডস নিউক্লিক এসিড সংক্ষেপে পিএনএ। যদিও বিভ্রান্তিকরভাবে আমরা এখনো পিএনএ'কে জানি পেপটাইড নিউক্লিক এসিড নামে। আরএনএ'র পিএনএ গঠন এত দুঃসাধ্য নয়, সম্ভবত পৃথিবীর আদিম অবস্থায় পিএনএ গঠিত হয়েছিল।

পিএনএ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, একে সৃষ্টি করতে হয় এবং আচরণ অনেকাংশে ডিএনএ'র মতো। পিএনএ'র সুতার মতো একটা প্রান্ত ডিএনএ'র একটা প্রান্ত দখল করে নিতে পারে। অণুজীবের এই মিলে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তদুপরি পিএনএ, ডিএনএ'র মতো দুইটা প্রান্ত পেঁচিয়ে মইয়ের আকার ধারণ করতে পারে। স্ট্যানলি মিলার এখানেই আমাদেরকে মুগ্ধ করে এবং প্রাণ সৃষ্টির রহস্য জগতে কৌতূহলী করে তোলে। তিনি প্রাণের বিকাশ হয়ে আরএনএ থেকে এই তত্ত্বের ঘোরতর অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন প্রথম প্রাণের উপাদান সৃষ্টিতে পিএনএ বরং অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য এবং যুক্তিপূর্ণ দাবীদার।

২০০০ সালে স্ট্যানলি মিলার আরও শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। ইতোমধ্যে তিনি ৭০ বছরের অভিজ্ঞতায় পৌঁছে গেছেন। কিন্তু বিধি বাম, সেই সময়ে তিনি পরপর কয়েকটি ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন ফলে তাঁকে গবেষণা ছেড়ে নার্সিং হোমে চলে যেতে হয়। তাঁর কাজ আর সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মিলার তাঁর সেই ক্লাসিকাল 'স্ট্যানলি মিলার-হ্যারল্ড উরে পরীক্ষা' পুনরায় করে দেখেন যে পরীক্ষার কথা আমরা ইতোমধ্যেই প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এবারের পরীক্ষায় মিলার মিথেন, নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়া, পানির সাথে পিএনএ যুক্ত করে দিলেন।
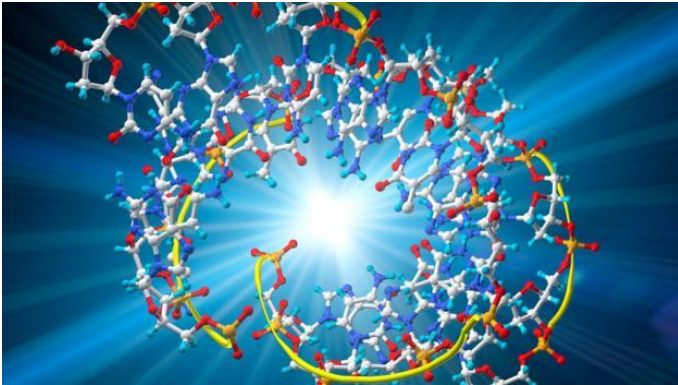
A molecule of threose nucleic acid (TNA)
(Credit: Alfred Pasieka/Science Photo Library)

অন্যান্য রসায়নবিদগণ প্রাণ গবেষণায় এগিয়ে এলেন তাঁদের নিজস্ব বিকল্প নিউক্লিক এসিড এবং তাঁদের তত্ত্ব ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান নিয়ে। প্রতিটি বিকল্প নিউক্লিক এসিড ব্যবহারের পিছনে ভিন্ন ভিন্ন সমর্থক বিজ্ঞানীদলের বিশেষ করে যাঁরা এই এসিডের উদ্ভাবন করেছেন তাঁদের পৃথক যুক্তি আছে। ২০০০ সালে আলবার্ট ইসেনমসার কৃত্রিম জেনেটিক পলিমার 'থ্রেওস নিউক্লিক এসিড' উদ্ভাবন করেন। থ্রেওস নিউক্লিক এসিড বা টিএনএ মূলত ডিএনএ কিন্তু এর রাইবোজোমে ভিন্ন ধরণের শর্করা আছে। টিএনএ রাইবোজোমের সুতোর প্রান্ত দুইটা দ্বিমুখী কুণ্ডলী বানাতে পারে এবং আরএনএ এবং টিএনএ'র মাঝে পূর্বাপর তথ্যের অবিকল প্রতিলিপি আদান প্রদান করতে পারে। এছাড়াও টিএনএ জটিলতর ভাজে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারে এবং প্রোটিন সংরক্ষণ করতে পারে। এথেকেই বোঝা যায় টিএনএ আরএনএ'র মতই এনজাইমের কাজ করতে পারে। একইভাবে ২০০৫ সালে এরিক মেগারস গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে গ্লাইকল নিউক্লিক এসিড উৎপাদন করলেন যেগুলো প্যাঁচানো কাঠামো তৈরি করতে পারে। এতক্ষণ যতগুলো নিউক্লিক এসিড নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাদের কোনটিই প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, সৃষ্টি হয়েছে গবেষণাগারে। সুতরাং যদি প্রথম প্রাণ এইসব নিউক্লিক এসিডের মধ্য থেকে কোনো একটিকে ব্যবহার করে থাকে তাহলে বলতেই হবে এতদিনের চলমান বিতর্ক চলে যাবে আরএনএ এবং ডিএনএ'র পক্ষে অর্থাৎ প্রাণের যাত্রা শুরু হয়েছিল আরএনএ এবং ডিএনএ দিয়ে। এই মতবাদ হয়তো সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানীদের হাতে এই দাবীর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

আর এইসব কিছুর অর্থ দাঁড়ালো, ২০০০ শতকের মাঝামাঝি উপনীত হয়ে আরএনএ মতবাদের বিজ্ঞানীগণ প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। আরএনএ মতবাদের বিজ্ঞানীগণের চিন্তা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ খুব যৌক্তিক এবং গোছানো পরিপাটি কিন্তু প্রাণের উৎস সম্পর্কে পুরোপুরি সত্যের কাছে পৌঁছাতে পারেননি।

অন্যদিকে আরএনএ এনজাইম প্রকৃতিতেই বিদ্যমান ছিল এবং সুসংবাদ হলো সেই এনজাইমে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক উপাদান রাইবোজোমের উপস্থিতি ছিল। কিন্তু এমন কোনো আরএনএ'র সন্ধান পাওয়া গেল না যে নিজেই নিজের অনুরূপ প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে এবং কোন বিজ্ঞানীই প্রমাণ করতে পারলেন না যে আদিম ঘন তরল স্যুপ থেকে কীভাবে আরএনএ সৃষ্টি হয়েছিল। বিকল্প নিউক্লিক এসিড হয়তো পরবর্তী প্রশ্নের সমাধান দিতে সক্ষম কিন্তু হতাশার খবর এই যে, প্রাণের এইসব প্রাথমিক উপাদানগুলো প্রকৃতিতে আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল তার কোনো নির্ভুল প্রমাণ বিজ্ঞানীগণের হাতে নেই। ঠিক সেই সময়ে আশির দশক থেকে আরএনএ মতবাদের বিরোধী আর একটি মতবাদ ধীরে ধীরে তাঁদের যুক্তির সপক্ষে প্রমাণ যোগার করতে ব্যস্ত ছিল। নতুন মতবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীগণ যুক্তি দেখাতে লাগলেন জীবন আরএনএ বা ডিএনএ বা অন্য কোনো বংশগতির বস্তু থেকেও নয় বরং জীবন সৃষ্টি হয়েছিল শক্তির যান্ত্রিক কৌশল ত্বরান্বিত করে। কারণ জীবনকে বেঁচে থাকতে হলে দরকার শক্তির।

চতুর্থ অধ্যায়
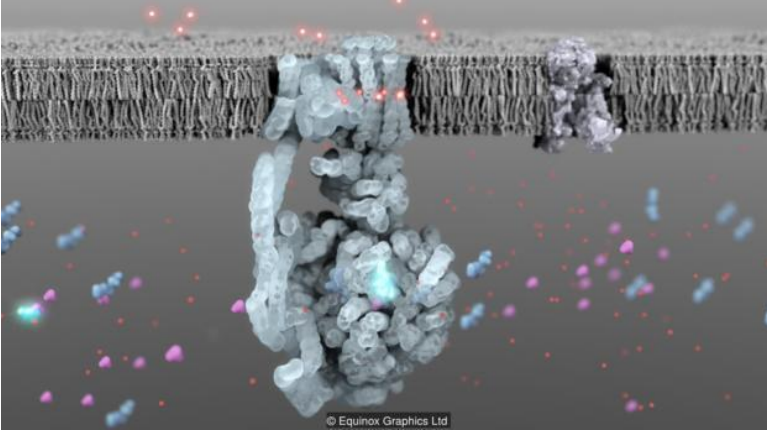
Life needs energy to stay alive

(Credit: Equinox Graphics Ltd)

প্রোটনের শক্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কীভাবে ঘটেছিল প্রথম প্রাণের বিকাশ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীকুল তিনটি চিন্তাধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীগণের একপক্ষ মনে করেছিলেন প্রাণের সূচনা ঘটেছিল RNA অণুজীব থেকে। কিন্তু শুধু মতামত দিয়েই তারা ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন কীভাবে RNA বা তাঁর সমগোত্রীয় অণুজীব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৃথিবীর প্রথমদিকের পরিবেশে প্রাণ সৃষ্টি করেছিল এবং সেই আদি প্রাণ কীভাবে নিজেরা নিজেদের প্রতিলিপি সৃষ্টি করেছিল। শুরুর দিকে তাঁদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট আশা জাগানিয়া হলেও

শেষপর্যন্ত তাঁদের শ্রম হতাশায় পর্যবসিত হয়। যাই হোক, প্রাণ সৃষ্টির গবেষণা এগিয়ে চলছিল কিন্তু সেই সময়ে আরেক দল বিজ্ঞানী যাঁরা প্রাণের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করছিলেন তাঁরা বুঝতে পারলেন প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উপায়ে।

RNA ঘরানার চিন্তা নির্ভর করে খুব সাধারণ কিছু ধারণার ওপর আর সেটা এইযে, কোনো জীবিত প্রাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তারা নিজেদের পুনরুৎপাদন করতে সক্ষম। বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানী এই ধারণার সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। ক্ষুদ্র কোষের ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে সুবিশাল নীল তিমি পর্যন্ত সব জীবিত প্রাণীই বংশ বৃদ্ধি করতে তৎপর।

জার্মান বিজ্ঞানী গুন্টার ভাস্টারশাওজার ধারণা করেন প্রথম অণুজীব ছিল বিস্ময়করভাবে নতুন কোনো অণুজীব যেটা আমাদের জানাশোনার বাইরে। যাই হোক অনেক ‘প্রাণের উৎস সন্ধানী’ গবেষক বংশবিস্তারই প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল বংশ বিস্তারের আগে সেই সকল প্রাণকে প্রথমে টিকে থাকার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই জীবিত থাকতে হবে। তাঁরা বলেন, “প্রথমেই যদি আপনি পটোল তুলে ফেলেন তাহলে বাচ্চা পয়দা করতে পারবেন না!”

আমরা আমাদের বাঁচিয়ে রাখি খাবার খেয়ে, একইভাবে সবুজ উদ্ভিদ বেঁচে থাকে সূর্যালোক থেকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তি আহরণ করে। আপনার এরকম চিন্তা করার সুযোগ নেই যে একজন মানুষ নিজের শক্তির যোগানের জন্য পত্রপল্লবিত একটা ওক গাছের শাখায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেমন ভাবে নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুস্বাদু রসালো মাংসের হাড়ের উপর। কিন্তু আপনি যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন তো দেখবেন মানুষ আর নেকড়ে উভয়ই বেঁচে থাকার শক্তি আহরণ করছে একই পদ্ধতিতে।

Volcanic water is hot and rich in chemicals
(Credit: Kseniya Ragozina/Alamy)

খাদ্য গ্রহণের এই চলমান ধরনকে বলে বিপাক প্রক্রিয়া। প্রথমেই আপনাকে শক্তি আহরণ করতে হবে, যেমন শক্তি সমৃদ্ধ রাসায়নিক উপাদান চিনি। তখন আপনাকে সেই শক্তি দিয়ে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সৃষ্টি করতে হবে, যেমন দেহকোষ। শক্তিকে ত্বরান্বিত করার এই প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক গবেষক মনে করেন জীবন সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রথমে এমনটাই ঘটেছিল।

শুধু খাদ্যগ্রহণ আর বিপাকনির্ভর আদি অণুজীব দেখতে কেমন ছিল? সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন জার্মান রসায়নবিদ গুন্টার ভাস্টারশাওজার। যদিও তিনি পুরোপুরি বিজ্ঞানী নন বরং তিনি রসায়ন বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে প্যাটেন্ট আইন-পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন, প্রথম অণুজীব কোনো কোষ দিয়ে গঠিত ছিল না। তাদের এনজাইম, DNA or RNA বলে কিছু ছিল না। বরং উন্নত অণুজীব যেগুলো দেখতে পাই তাদের DNA, দেহকোষ, মস্তিষ্ক পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে। গুন্টার ভাস্টারশাওজার মনে করেছিলেন আদি পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছিল গরম পানির স্রোত। লাভা মিশ্রিত সেই পানি ছিল অ্যামোনিয়া গ্যাস, খনিজ উপাদানে

সমৃদ্ধ। যখন লাভামিশ্রিত খনিজ পানি পাথরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো তখন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে শুরু করলো। বিশেষত, লাভামিশ্রিত পানির মধ্যে দ্রবীভূত খনিজ উপাদান, ধাতু প্রথম দিকের জৈবকণা গঠনে সাহায্য করেছিল যারা বিভাজন প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর জৈবকণায় পরিণত হয়।

অণুজীবের প্রথম বিপাক ক্রিয়ার চক্র সৃষ্টি ছিল জীবন বিকাশের যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রক্রিয়ায় একটা রাসায়নিক উপাদান কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে পরিণত হয়। মূল রাসায়নিক উপাদান বিক্রিয়া না করা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পুরো প্রাকৃতিক উপাদান থেকে অণুজীব শক্তি সঞ্চার করে এবং পুনরায় নতুন চক্র শুরুর সাথে অন্যান্য কাজ করতে শুরু করে। বিপাক চক্রের সাথে জীবন চক্রের কোনো মিল না থাকলেও দুই প্রক্রিয়াই জীবনের মৌলিক উপাদান। যেসব উপাদানের সমন্বয়ে উন্নত জৈবকণা সৃষ্ট যেমন DNA, জীবদেহের কোষ, মগজ এসবই বিপাক প্রক্রিয়ার রাসায়নিক চক্র থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বিপাক প্রক্রিয়া জীবন চক্রের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও গুন্টার ভাস্টারশাওজার জীবন সৃষ্টির পূর্ব শর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করলেন এবং লিখলেন “বিপাক প্রক্রিয়াকে প্রায় জীবন্ত কর্মকাণ্ড বলা যায়।”

ভাস্টারশাওজার বিপাক প্রক্রিয়াকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বর্ণনা দিলেন। পাঠক লক্ষ করুন, আপনার শরীরের প্রতিটি কোষ মূলত আণুবীক্ষণিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কারখানা, যেখানে নিয়মিত এক রসায়ন থেকে অন্য রসায়নে রূপান্তরিত হচ্ছে।

১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ভাস্টারশাওজার তাঁর নিজের তত্ত্বের ওপর বিস্তারিত কাজ করেছেন। তিনি রীতিমত খাতা-কলমে দেখিয়ে দিলেন ভূমির উপরিভাগের জন্য কোন খনিজ উপাদান ভালো কাজ করে এবং সেখানে কোন রাসায়নিক চক্র বিক্রিয়া করে। তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্ব সমর্থকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে

সক্ষম হলো। কিন্তু তাঁর গবেষণা এখন পর্যন্ত তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভাস্টারশাওজারের দরকার ছিল তাঁর তত্ত্বের বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা আবিষ্কার যা তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আশার কথা হলো, প্রায় এক দশক আগেই তাঁর তত্ত্বের সপক্ষে কিছু আবিষ্কার ঘটে গেছে।
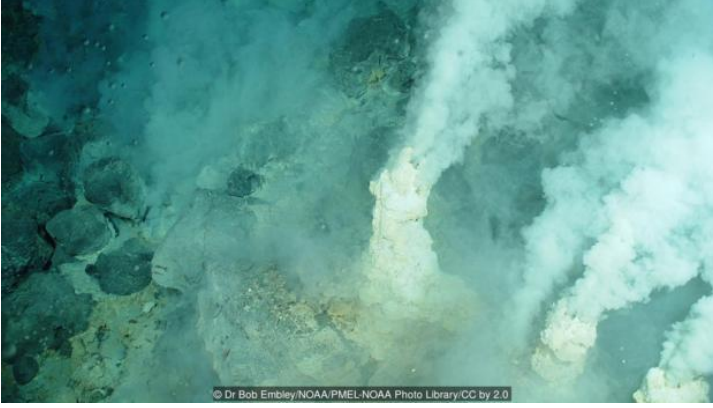
Vents in the Pacific

(Credit: Dr Bob Embley/NOAA/PMEL-NOAA Photo Library/CC by 2.0)

১৯৭৭ সালে ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যাক করলিসের নেতৃত্বে একদল গবেষক প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তে ১.৫ মাইল গভীর তলদেশে নিমজ্জিত হন। তাঁরা গালাপোগাসের উষ্ণ উর্বর অঞ্চলে জরিপ পরিচালনা করেন যেখানে মহাসাগরে তলদেশের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে দীর্ঘ পাথুরে পাহাড়ের খাঁড়ি। গবেষকদল জানত পাহাড়ের খাঁড়িগুলো ছিল জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। প্রতিটি জ্বালামুখই এক প্রকারের প্রাচীন গরম ঘন তরল উদগীরণের আধার।

জ্যাক করলিস এবং তাঁর গবেষকদল দেখতে পেলেন পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে প্রধানত উষ্ণ ঝর্ণাধারা। সেখানে সমুদ্রের তলায় পাথুরে শিলাখণ্ডের অসংখ্য ছিদ্রপথ দিয়ে খনিজ সমৃদ্ধ গরম তরল প্রবাহিত হচ্ছে। অবাক কাণ্ড হলো এইসব গরম তরল জ্বালামুখের আশেপাশে কিছু অদ্ভুত জলজ প্রাণীদের প্রচুর আনাগোনা। সেখানে বিপুল

পরিমাণ ঝিনুক, শামুক, টিউব-ওয়ার্ম, কোরালের ঘনবসতি। এই এলাকার পানিতে ব্যাকটেরিয়ায় সয়লাব। উল্লেখিত সব প্রাণীই গরম তরল জ্বালামুখ থেকে উৎসারিত শক্তি ব্যবহার করে বেঁচে আছে।

এই গরম তরল জ্বালামুখ আবিষ্কারকে করলিসের নামে নামকরণ করা হয়। গরম তরল জ্বালামুখের আবিষ্কার তাকে নতুন চিন্তার দিকে টেনে নিয়ে গেল। **১৯৮১** সালে তিনি তত্ত্ব দিলেন চার বিলিয়ন বছর আগের পৃথিবীতেও একই ধরণের গরম তরল জ্বালামুখের অস্তিত্ব ছিল এবং ঠিক সেখানেই প্রাণের সূচনা ঘটেছিল। করলিস তাঁর পেশা জীবনের বাকিটা সময় তাঁর প্রস্তাবিত মতবাদের ওপর কাজ করে অতিবাহিত করেছিলেন।

Hydrothermal vents support strange life

(Credit: Dr Ken MacDonald/Science Photo Library)

করলিস দাবী করেন গরম তরলের জ্বালামুখ অনেক রাসায়নিকের জটিল যৌগ সৃষ্টি করতে পারে। তিনি বলেন, প্রতিটি জ্বালামুখ প্রাচীনকালের গরম স্যুপের থকথকে বস্তু। জটিল যৌগের প্রধান উপাদান ছিল হয়তো চিনি বা শর্করা যার উপর ভিত্তি করে আমরা প্রতিটি সেকেন্ড বেঁচে আছি।

যখন গরম পানির স্রোত পাথরকে প্লাবিত করত তখন প্রচণ্ড তাপ এবং চাপে সরল জৈবকণা ভেঙে জটিল-যৌগ থেকে ক্রমাগত জটিলতর এমাইনো এসিড, নিউক্লিওটায়েড এবং চিনিতে রূপান্তরিত হয়। সমুদ্রের তটরেখা বরাবর যেখানে পানি এতটা গরম নয় যেখানে শর্করা, প্রোটিন এবং ডিএনএ'র মতো প্রাণ বিকাশের আদি আবর্তন শুরু হলো। এরপর পানিটা যখন আবার সমুদ্রে ফিরে যায় এবং তখনো ঠাণ্ডা হতে যথেষ্ট বাকি তখন মোলকিউল একত্রিত হয়ে সরল এককোষী প্রাণের জন্ম হলো। প্রাণের সূচনা কীভাবে আলোচনায় করলিসের এই প্রস্তাবনা অনেক নিখুঁত এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। কিন্তু 'কীভাবে প্রাণের সূচনা' তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে স্ট্যানলি মিলারের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রাণের উৎস কি সেটা মানুষকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৮৮ সালে মিলার যুক্তি দেখিয়ে একটা আর্টিকেল লিখলেন গরম তরলের জ্বালামুখও অনেক গরম। মিলারের যুক্তি অনুসারে প্রচণ্ড তাপের সময়ে যদি অ্যামাইনো এসিডের রাসায়নিক গঠন শুরু হয় তখন তো সেই তাপের অ্যামাইনো এসিডও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। প্রচণ্ড তাপে অ্যামাইনো এসিডের প্রধান উপাদান চিনি জাতীয় শর্করা বড়জোর কয়েক সেকেন্ড টিকে থাকতে পারবে। তদুপরি এইসব সরল জৈবকণা নিজেদের মাঝে বন্ধন তৈরি করতে পারে না কারণ গরম তরল জ্বালামুখের চারিপাশের পানি এত গরম যে জৈব-কণার বন্ধন মুহূর্তে ভেঙে দেয়।
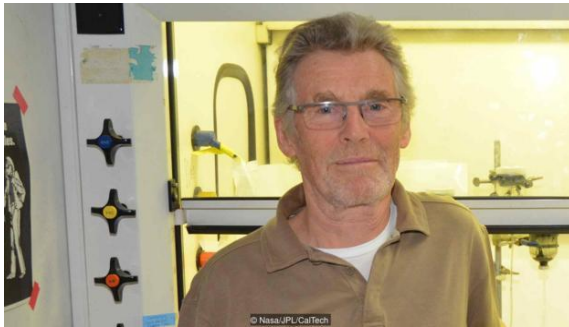
Geologist and origin-of-life researcher Michael Russell

(Credit: Nasa/JPL/CalTech)

ঠিক সেই সময়ে প্রাণের উৎস গবেষণার যুদ্ধে যোগ দিলেন ফ্রান্সের গ্রেনোবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক প্রফেসর মাইকেল রাসেল। গরম তরলের জ্বালামুখের ধারণা মোটামুটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর তত্ত্ব। মাইকেল রাসেলের কাছে মনে হলো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের পরিবেশই ভাস্টারশাওজারের জৈবকণা উৎপন্ন হওয়ার সূতিকাগার। এই অনুপ্রেরণা থেকেই রাসেল প্রাণের উৎস গবেষণার সর্বজন স্বীকৃত তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে ফেললেন। রাসেলের তত্ত্ব যদি সঠিক হয় তাহলে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সমুদ্রের তলদেশে। মাইকেল রাসেল তাঁর জীবনের শুরুর দিকে ব্যথানাশক এসপিরিন তৈরিতে, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান গবেষণায় সময় কাটিয়েছিলেন। এরমধ্যেই ১৯৬০ সালে ঘটে গেল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এইসময়ে রাসেল একটা আগ্নেয়গিরির সম্ভাব্য অগ্ন্যুৎপাত মোকাবিলাকারী দলের সমন্বয় করছিলেন, যদিও অগ্ন্যুৎপাত মোকাবিলা করার জন্য তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিল না। কিন্তু তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সময়ের ফেরে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ কীভাবে বদলে যায়। ভূতত্ত্বের এই পরিবর্তনের আঙ্গিকেই তিনি প্রাণের উৎস কীভাবে হলো তাঁর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের পাশ থেকে জীবাশ্ম পেয়ে গেল্েন যেখানের তাপমাত্রা ছিল ১৫০ সেলসিয়াসের নিচে। অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রার কারণেই রাসেল যুক্তি দেখালেন জৈব-কণার টিকে থাকার সম্ভাবনা প্রচুর। যদিও মুলার ধারণা করেছিলেন সেখানে জৈব-কণার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রচুর। অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রার জ্বালামুখের কাছে প্রাপ্ত ফসিলে কিছু অদ্ভুত জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেল। ফসিলে লোহার আকরিক পাইরাইট এবং সালফার দিয়ে গঠিত ১ মিলিমিটার দীর্ঘ গোলাকার খনিজের উপস্থিতি ছিল। রাসেল তার ল্যাবরেটরিতে ফসিল পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন পাইরাইট নিজেই গোলাকার ঘন খনিজ তরলের বুদবুদ তৈরি করতে পারে। তিনি পরামর্শ দিলেন প্রথম জটিল জৈব-কণার গঠিত হয়েছিল এইসব সাধারণ পাইরাইট আকরিকের মধ্যে।

A lump of iron pyrite

(Credit: James Petts, CC by 2.0)

একই সময়ে ভাস্টারশাওজার প্রাণের উৎস গবেষণায় তাঁর ধারণা প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর মতবাদ ছিল খনিজের উপর প্রবাহিত রাসায়নিক পদার্থ সমৃদ্ধ গরম স্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনকি তিনি প্রস্তাব করেন যে প্রাণের সূচনায় পাইরাইটের ভূমিকা ছিল। তাঁর মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের ভুলে যাওয়া মেধাবীদের কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রাসেল এখানে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়েছেন। তিনি বলেন সমুদ্রের গভীরে গরম তরল জ্বালামুখের চারপাশের সহনীয় গরম পানিতে নরম জেলিসদৃশ বস্তু পাইরাইটের কাঠামো গঠনের জন্য উপযুক্ত উপাদান হিসেবে কাজ করে। ভাস্টারশাওজারের প্রস্তাবিত জৈবকণা সৃষ্টির জন্য পাইরাইট বুদবুদ পূর্বশর্ত। যদি রাসেলের গবেষণা সঠিক হয় তাহলে জীবনের শুরু হয়েছিল সমুদ্রের গভীর তলে এবং সেখানেই প্রথম জৈব-কণার পরিপাকতন্ত্র সৃষ্টি হয়।

মিলারের ঐতিহাসিক গবেষণামূলক পরীক্ষণের ৪০ বছর পরে রাসেল তাঁর গবেষণার সমস্ত অর্জন ১৯৯৩ টেরা এনভায়রনমেন্টাল রিসার্স ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশ করেন। যদিও রাসেলের গবেষণার ফলাফল নিয়ে গণমাধ্যমে তেমন মাতামাতি হলো না কিন্তু প্রাণের উৎস গবেষণা এবং আলোচনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রইলো। ভাস্টারশাওজারের পরিপাক ক্রিয়ার চক্র এবং করলিসের গরম তরলের জ্বালামুখের দৃশ্যত দুইটা ভিন্ন ধারণাকে রাসেল একসাথে সমন্বয় সাধন করেন, যার ফলে বিষয়টা আরও বোধগম্য হলো। রাসেল গবেষণাকে আরও হৃদয়গ্রাহী করতে তার পরীক্ষণের ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, কীভাবে প্রথম জৈবকণা শক্তি সঞ্চার করেছিল। অন্যভাবে বলা যায় তিনি দেখান কীভাবে জৈব-কণার পরিপাকক্রিয়া কাজ করে।
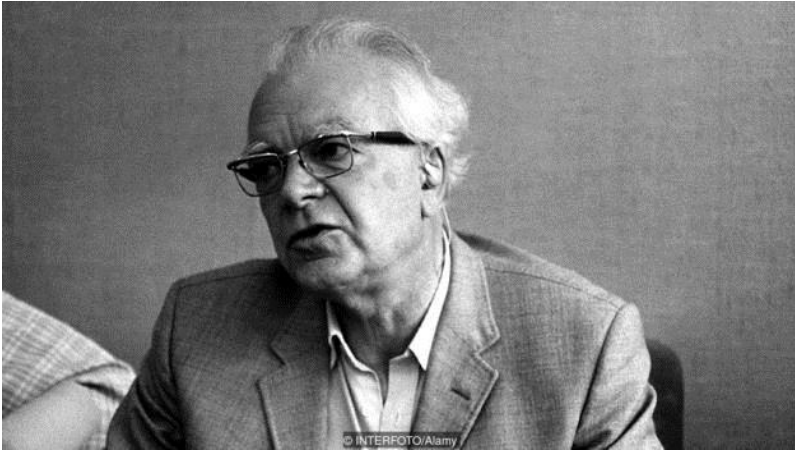
(পিটার মিশেল তার গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।)

১৯৬০ সালের দিকে জৈবরসায়ন বিজ্ঞানী পিটার ডেনিস মিচেল অসুস্থ হয়ে পড়লে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাঁর পরিবর্তে কর্নওয়ালে দূরের এক নিভৃত অঞ্চলে ব্যক্তিগত গবেষণাগার স্থাপন করেন। তখন বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শের বাইরে থাকতেন তিনি। তাঁর গবেষণার খরচের বিরাট অংশ আসে একপাল গরুর দুধ বিক্রির টাকা থেকে। অনেক জৈবরসায়ন বিজ্ঞানী যেমন

লেসলি ওরগেল, যার RNA সংক্রান্ত কাজ নিয়ে এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে তিনি মিশেলের গবেষণার কাজকর্মকে হাস্যকর বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু এখন আমরা জানি পিটার মিশেল যে প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকুল সেটাই ব্যবহার করে। দুই দশকেরও কম সময়ের মধ্যে মিচেল চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করলেন; ১৯৭৮ সালে রসায়নে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন। মিশেলের নাম হয়তো দৈনন্দিন গৃহস্থালি জীবনে কখনো দেখা পাওয়া যায় বা কিন্তু তাঁর নাম লেখা আছি জীববিজ্ঞানের প্রতিটি পাঠ্যবইতে।

পিটার মিশেল তাঁর পেশাগত জীবন কাটালেন জৈবকণা কীভাবে খাদ্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তার কারণ অনুসন্ধানের পিছনে। ফলশ্রুতিতে, তাঁর একটাই জিজ্ঞাসা ছিল কীভাবে আমরা প্রতি মুহূর্তে বেঁচে আছি। তিনি জানতেন প্রতিটি দেহকোষ তাদের শক্তি সঞ্চিত রাখে একই মলিকিউলের মধ্যে। যাকে আমরা এডেনোসাইন ট্রাইফসফেট (এটিপি) বলি। ফসফেটের তিনটি রাসায়নিক অণুর মেলবন্ধনে একত্রিত হয়ে আছে এডেনোসাইন। এদের মধ্যে ফসফেটের তৃতীয় অণুটি বেশী শক্তি গ্রহণ করে এটিপি'র সাথে মিলিত হয়। যখন কোন একটা কোষের শক্তি প্রয়োজন হয় – ধরে নিই, যদি মাংসপেশির কোন কাজ করার প্রয়োজন হয় তখন এটিপি থেকে ফসফেটের তৃতীয় অণু ভেঙে যায়, ফলে বাকি দুইটা অণু মিলে এডেনোসাইন ডাইফসফেট (এডিপি) তৈরি হয় এবং শক্তি উৎপাদিত হয়।

মিশেল জানতে চাইলেন প্রাণী দেহের কোষ কীভাবে প্রথম এটিপি তৈরি করেছিল? কীভাবেই বা কোষের শক্তি এডিপি'তে সঞ্চিত হলো? কীভাবে ফসফেটের তৃতীয় অণুটি কোষে যুক্ত ছিল? মিশেল জানতেন, যে এনজাইম এটিপি গঠন করেছে সেটা কোষের পাতলা আবরণের উপরে অবস্থান করে। তাই তিনি প্রস্তাব করেন কোষ এনজাইমের পাতলা আবরণের উপর থেকেই প্রোটন কণা থেকে শক্তি সঞ্চার করে। সুতরাং আবরণের একপাশে থাকে প্রচুর প্রোটন-কণা এবং অপর প্রান্তে হয়ত কিছুই থাকে না। কোষের উভয়দিকে প্রোটন-কণার সমতা আনার জন্য প্রোটন-কণার প্রবাহ

তখন আবরণের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রোটনকণাগুলোকে এনজাইম ভেদ করে যেতে হয়। এনজাইমকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় প্রোটন-কণার প্রবাহ এনজাইমকে এটিপি গঠনের প্রয়োজনীয় শক্তি দিয়ে যায়।

মিশেল কোষের শক্তি সঞ্চয়ের ধারণাকে প্রকাশ করেন ১৯৬১ সালে। পর্যাপ্ত প্রমাণাদি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এরপরের ১৫ বছর তিনি ব্যয় করেন কোষ কীভাবে কাজ করে ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে। এখন আমরা সকলেই জানি প্রতিটি জীব কোষ কীভাবে বেঁচে আছে যেটা মিশেল সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ঠিক এই মুহূর্তে আপনার শরীরের প্রতিটি কোষে কোষে একই প্রক্রিয়া চলছে আমৃত্যু। ঠিক যেমন আমরা সবাই জানি ডিএনএ জীবনের মূল উপাদান। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা মাইকেল রাসেল উত্থাপন করেন সেটা হলো পিটার মিশেলের প্রোটন-কণা। আমরা আগেই পড়েছি কোষের গায়ে ঝিল্লির মতো পাতলা আবরণের একপ্রান্তে প্রচুর প্রোটন থাকে অপর-প্রান্তে প্রোটন সংখ্যায় প্রায় নগণ্য। শক্তি সঞ্চয় করে রাখার জন্য প্রতিটি কোষেরই প্রোটন গ্র্যাডিয়েন্ট (কোন বস্তুর স্তর বা ধাপ) দরকার আছে।

আধুনিক কোষগুলো পাতলা ঝিল্লির মতো আবরণের ভিতর দিয়ে প্রোটনের প্রবাহ থেকে গ্র্যাডিয়েন্ট গঠন করে। কিন্তু এর জন্য জটিল প্রাণ-রাসায়নিক প্রক্রিয়া দরকার যা তখন পর্যন্ত অবিকশিত প্রাণে উঁকি দেয়নি। এই পর্যায়ে মাইকেল রাসেল প্রাণ বিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির ধাপ অতিক্রম করলেন। তিনি বললেন, প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে অবশ্যই প্রাকৃতিক কোনো স্থানের প্রোটনের স্তরবিন্যাস থেকে। প্রাকৃতিক সেই স্থানটা হলো গরম তরল প্রবাহের জ্বালামুখের এলাকা। কিন্তু সেই জ্বালামুখ ছিল বিশেষ একধরণের যখন পৃথিবী সবে সদ্যজাত শিশু এবং তার সমুদ্রগুলোর পানি ছিল তীব্র ক্ষারযুক্ত। আমরা জানি, ক্ষার পানিতে প্রচুর প্রোটন-কণা ভাসতে থাকে। প্রোটনের স্তর সৃষ্টির জন্য জ্বালামুখ থেকে প্রবাহিত পানিতে অবশ্যই পরিমাণে অল্প হলেও প্রোটনের উপস্থিতি থাকতে হবে, যাকে আমরা বলব

এলকালাইন। জ্যাক করলিসের আবিষ্কৃত গরম তরল প্রবাহের জ্বালামুখ আশানুরূপ কার্যকর ছিল না। তাঁর আবিষ্কৃত জ্বালামুখের এলাকা ছিল খুব উত্তপ্ত আর অত্যধিক ক্ষারযুক্ত। কিন্তু ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ওশেনোগ্রাফির অধ্যাপক দেবরাহ কেলি ২০০০ সালে প্রথম এলকালাইন সমৃদ্ধ জ্বালামুখের সন্ধান পান।

© 916 Collection/Alamy
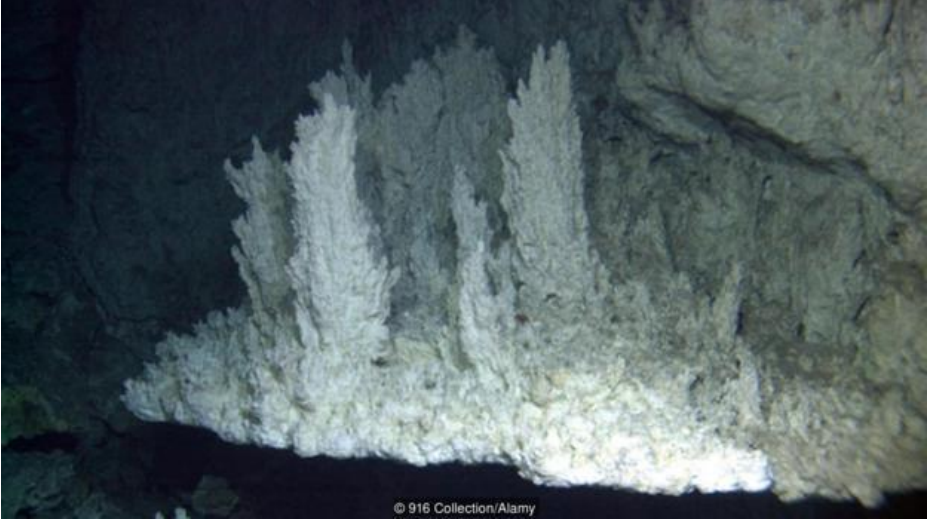
(আটলান্টিক মহাসাগরে-র তলদেশে গরম তরল ক্ষেত্রে "লুপ্ত নগরীর" কিছু অংশ)

কেলিকে বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য প্রথমদিকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে। হাইস্কুলে লেখাপড়া চলাকালীন সময়ে তাঁর বাবা মারা যান বলে তাঁর কলেজের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তাকে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হতো। কিন্তু তার পরিশ্রম সফল হয়েছিল এবং তিনি সমুদ্রের তলদেশের আগ্নেয়গিরি আর উত্তপ্ত তরল প্রবাহের জ্বালামুখের গবেষণায় আকৃষ্ট হন। এই দুইটা আগ্রহের প্রতি ভালবাসা তাঁকে নিয়ে গেল আটলান্টিক মহাসাগরের অতল গভীরে যেখানে ভূ-পৃষ্ঠ বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যাচ্ছে পরস্পর থেকে দূরে এবং সমুদ্রের তল থেকে জেগে উঠছে পর্বতের খাঁড়ি।

পাহাড়ের খাঁজগুলোতে দেবরাহ কেলি পেয়ে গেলেন উত্তপ্ত পানি প্রবাহের জ্বালামুখের ক্ষেত্র যাকে তিনি 'লুপ্ত নগরী' হিসেবে অভিহিত করলেন। এই জ্বালামুখগুলো করলিসের আবিষ্কৃত জ্বালামুখের মতো নয়। এখানের জ্বালামুখ দিয়ে প্রবাহিত পানির উষ্ণতা মাত্র ৪০ থেকে ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে এবং পানিতে এলকালাইনের উপস্থিতিও খুব সহনীয় মাত্রায়। সেখানের পানিতে কার্বন মিশ্রিত স্তূপ ক্রমশ খাড়া হয়ে উপরের দিকে প্রবাহিত যেগুলো দেখতে অনেকটা চিমনির সাদা ধোঁয়ার মতো। সমুদ্রের তলদেশের পর্বতের খাঁড়ি থেকে উত্থিত সাদা ধোঁয়াকে মনে হচ্ছিল যেন গোলাকার জীবন্ত কোন পাইপ সদৃশ বস্তু। সেই পাইপের চেহারা অদ্ভুত এবং খানিকটা আশ্চর্য যেন মনে হয় ভূতের মতো। যদিও এটা ছিল বিভ্রান্তিকর কারণ, এখানেই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের এই ঘন তরলেই জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য ক্ষুদ্র অণুজীব।

এলকালাইন সমৃদ্ধ আগ্নেয়গিরির এইসব জ্বালামুখই ছিল মাইকেল রাসেলের তত্ত্ব প্রমাণের জন্য উপযুক্ত স্থান। তিনি বুঝতে পারলেন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের উত্তপ্ত তরল প্রবাহের এলাকায় 'লুপ্ত নগরীতে' জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু সমস্যার এখানেই সমাপ্তি নয়। যেহেতু রাসেল ছিলেন মূলত ভূতাত্ত্বিক সেই কারণেই তাঁর তত্ত্বকে বোধগম্য এবং প্রমাণ করার জন্য কোষ কীভাবে কাজ করে সেটা হাতে দেখানোর মতো জীববিজ্ঞানের পর্যাপ্ত জ্ঞান তাঁর ছিল না। সুতরাং রাসেল তাঁর গবেষণা দলে ডাকলেন আমেরিকান জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম মার্টিনকে। ইউলিয়াম মার্টিন একজন অতি উৎসাহী গবেষক যিনি তাঁর পেশাজীবনের বেশীরভাগ সময় কাটিয়েছেন জার্মানিতে উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং অণুজীববিজ্ঞানের পঠন পাঠনে। বর্তমানে তিনি জার্মানির ডুসেলফর্ফে হাইনরিখ হাইনে ইউনিভার্সিটির মলিকিউলার ইভোল্যুশন ইন্সটিটিউটের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। ২০০৩ সালে রাসেল এবং মার্টিন মিলিতভাবে রাসেলের পূর্বের তত্ত্বকে আরও আধুনিকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করলেন। এখন পর্যন্ত প্রাণের উৎস সন্ধানে যত গবেষণা হয়েছে এবার যেন সেই

গবেষণার কঙ্কালে রক্তমাংসের ছোঁয়া লাগলো এবং বিজ্ঞানী সমাজে প্রাণের উৎস গবেষণার এযাবৎ কালের অন্যতম গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হিসেবে মর্যাদা পেয়ে গেল।

(গরম তরলের জ্বালামুখ থেকে কালো ধোঁয়ার উদগীরণ)

দেবরাহ কেলিকে ধন্যবাদ, রাসেল এবং মার্টিনের গবেষকদল এখন দেবরাহ কেলির কল্যাণে জানতে পেরেছেন এলকালাইন সমৃদ্ধ পাথরের জ্বালামুখ ছিলো অসংখ্য ছিদ্র বিশিষ্ট চুনাপাথরের স্তর যেখানে দিয়ে বাতাস এবং পানি প্রবাহিত হতে পারত। পাথরের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্রে পানি দ্বারা পূর্ণ ছিল। পানি-পূর্ণ এইসব ছোট ছোট ছিদ্র প্রাথমিক কোষের কাজ করত বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রতিটি ছিদ্রে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক এবং পাইরাইট খনিজ উপাদান দ্বারা পূর্ণ ছিল। এর সাথে জ্বালামুখের গায়ের সাথে যুক্ত ছিল প্রোটন গ্র্যাডিয়েন্ট। এরকম পরিবেশই হলো কোষের বিপাক ক্রিয়া শুরু হওয়ার উপযুক্ত স্থান।

রাসেল এবং মার্টিন বললেন, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের পানিতে রাসায়নিক শক্তির বিক্রিয়াতে জীবন যখন সবে যাত্রা শুরু করেছে তখনই আরএনএ অণুজীবের জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়। এমনকি তখনই তারা ঝিল্লির মতো পাতলা আবরণ সৃষ্টি করেছে

যাকে আমরা বলতে পারি একটা সত্যিকারের কোষ বা প্রাণের বিকাশ। কোষের জন্ম সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে কোষ পাথরের ছিদ্র ছেড়ে পানিতে যাত্রা শুরু করে।

(গরম তরলের জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসা কোষ)

রাসেলের গবেষণার কিছু আলোচ্য বিষয় ঘষেমেজে নতুন করে মার্টিন ২০১৬ সালে 'প্রথম সর্বজনীন পূর্বপুরুষ' আর্টিকেল প্রকাশ করলে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে যায় এবং বিশাল সমর্থন অর্জন করেন। বিলিয়ন বিলিয়ন বছরে আগের সেই অণুজীব থেকেই বর্তমান পৃথিবীর বিদ্যমান সব প্রাণীর জন্ম হয়েছে। আরএনএ তত্ত্ব সমর্থকগোষ্ঠী বললেন, আগ্নেয়গিরিরির জ্বালা মুখ তত্ত্বের দুইটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একটার হয়ত সম্ভাব্য সমাধান বের করা সম্ভব কিন্তু অন্যটি খুব গুরুতর। কারণ, প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের জন্য সম্ভবত আমরা কোনদিনই "প্রথম সর্বজনীন পূর্বপুরুষ" অণুজীবের ফসিল উপস্থাপন করতে পারব না। কিন্তু যদিও আমরা আমাদের ইতিপূর্বের পঠন পাঠন দিয়ে বর্তমানে জীবিত অণুজীব দেখে অনুমান করতে পারি কেমন দেখতে ছিল সেই প্রাচীন অণুজীব আর কেমন ছিল তাদের আচরণ।

আরএনএ তত্ত্ব সমর্থকগোষ্ঠীদের প্রশ্নের জবাবে ইউলিয়াম মার্টিন ১৯৩০টি আধুনিক অণুজীবের ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখেন এবং ৩৫৫টি জিন শনাক্ত করে দেখান তাদের সবার একই বৈশিষ্ট্য। আরএনএ তত্ত্ব সমর্থকগোষ্ঠীদের বিতর্কের বিপরীতে প্রমাণস্বরূপ মার্টিন বলেন, ৩৫৫টি জিন বংশ পরম্পরায় একই বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে এবং ১৯৩০টি অণুজীবের পূর্বপুরুষ 'প্রথম সর্বজনীন পূর্বপুরুষ' অণুজীব থেকে উৎসারিত। মাইকেল রাসেল এবং ইউলিয়াম মার্টিনের তত্ত্বানুসারে ৩৫৫টি জিন কিছু প্রোটন গ্র্যাডিয়েন্টের সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু জিন এককভাবে কিছু করে না। তদুপরি, 'প্রথম সর্বজনীন পূর্বপুরুষ' অণুজীব মিথেনের মতো রাসায়নিক উপাদান এখনো বিদ্যমান। এর থেকে প্রমাণিত হয়, অণুজীব জন্ম নিয়েছিল জীবন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের পরিবেশে।

Hydrothermal vents are home to strange organisms like these anomuran crabs

(Credit: A. D. Rogers et al, PLoS Biology, CC by 2.5)

রাসেল এবং মার্টিনের প্রস্তাবিত তত্ত্বের প্রথম সমস্যা হলো তাদের তত্ত্ব শুধু ব্যাখ্যা, সেখানে গবেষণার কোনো পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ নেই। তাঁদের আছে শুধু ধাপে ধাপে প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। কিন্তু কোনো বিশ্লেষণই ল্যাবরেটরিতে দেখানো সম্ভব নয়। প্রাণের উৎস সন্ধানী বিজ্ঞানী আরমেন মালকিদজানিয়ান বললেন,

যেসব বিজ্ঞানীগণ মনে করেছিলেন কোষ নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে তাঁরা প্রতিনিয়ত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল তথ্য আকারে প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। যারা প্রাণের উৎস গবেষণায় বিপাক ক্রিয়া প্রথম শুরু হয়ে হয়েছিল মনে করেন তাঁরা আবার মনে করলেন, অণুজীবের এইসব রসায়ন পানির মধ্যে জন্ম নিতে পারে এটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। রাসেল এবং মার্টিনের গবেষণার এই পর্যায়ে এগিয়ে এলেন মার্টিনের সহকর্মী ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের প্রফেসর নিক লেন। তিনি গবেষণাগারে ‘ওরিজিন অফ লাইফ রিএক্টর’ বানালেন এবং দেখালেন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের এলকালাইনের পরিবেশ কেমন ছিল। তিনি দেখালেন অণুজীবের বিপাক ক্রিয়ার চক্র যেটা অণুজীবের আরএনএ’র মতো কাজ করে।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের অবস্থান ছিল গভীর সমুদ্রের তলদেশে। ১৯৮৮ সালে মিলার যেমন দেখিয়েছিলেন, অণুজীবের দীর্ঘ শৃঙ্খলে আরএনএ এবং প্রোটিন এনজাইমের সাহায্য ছাড়া গঠিত হতে পারে না। প্রাণের উৎস গবেষণার অনেক বিজ্ঞানীদের কাছেই এই যুক্তি অনেক যুক্তিযুক্ত মনে হলো এবং সেখানে রাসেল এবং মার্টিনের তত্ত্ব প্রায় ধরাশায়ী। আরমেন মালকিদজানিয়ান বললেন, “যদি আপনি রসায়ন বিষয়টা একটু পড়ে থাকেন, তাহলে আপনি গভীর সমুদ্রের তলদেশের আগ্নেয়গিরির গরম ঘন তরল প্রবাহের জ্বালামুখের তত্ত্ব মেনে নিতে পারবেন না করান আপনি জানেন রসায়নে এমন ধারণা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।” এত সমালোচনা সত্ত্বেও রাসেল এবং মার্টিনের গবেষকদল তাঁদের তত্ত্বে অটল থাকলেন। কিন্তু শেষ দশকে ক্রমাগত কয়েকটি অনন্য গবেষণার ফলাফল তৃতীয় আর একটা তত্ত্ব সামনে নিয়ে এলো। তৃতীয় তত্ত্বটি বলছে, আরএনএ বা গরম তরল জ্বালামুখের থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয়নি, প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে শূন্য থেকে সৃষ্ট কোনো কিছু থেকে।

পঞ্চম অধ্যায়
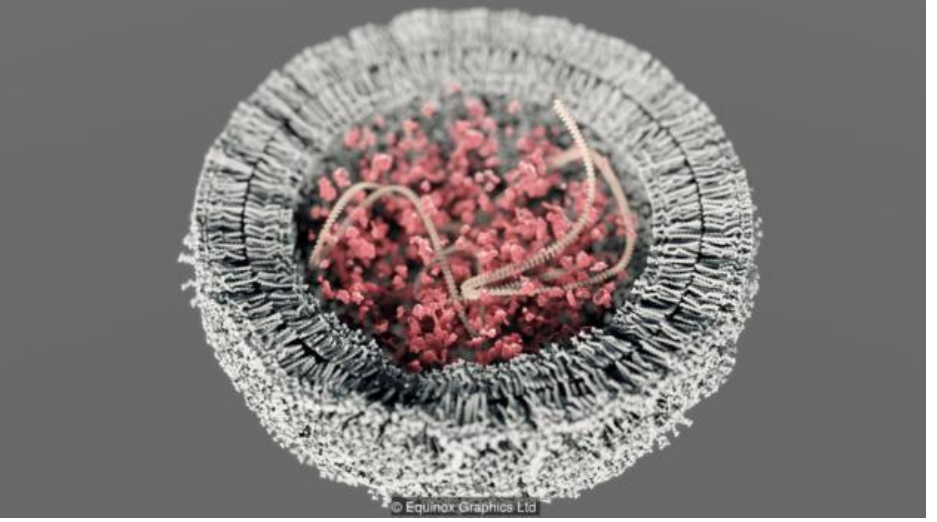
Arguably there can be no life without cells

(Credit: Equinox Graphics Ltd)

কোষের জন্ম

২০০০ সালের প্রথমদিকে জীবনের প্রথম পথ চলা কীভাবে শুরু হয় এই গবেষণার প্রধান দুইটা তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। আরএনএ ঘরানার বিজ্ঞানীগণ মনে করতেন প্রাণের বিকাশ হয়েছিল নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে এমন অণুজীব থেকে। ইতোমধ্যে যেসব বিজ্ঞানীগণ বিপাক ক্রিয়া প্রথম শুরু হয়েছিল বলে মনে করতেন তারা গভীর সমুদ্রের আগ্নেয়গিরির গরম তরল প্রবাহের জ্বালামুখে কীভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ হাজির করলেন। যাই হোক চলমান এই বিতর্কের

মধ্যেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে প্রাণের উৎস গবেষণার তৃতীয় আর একটা মতবাদ।

আমরা জানি পৃথিবীতে জীবিত সব প্রাণই কোষ দ্বারা গঠিত। প্রতিটি কোষই মূলত নরম তুলতুলে ছিদ্রযুক্ত গোলাকার সদৃশ বস্তু যার চারিধার অমসৃণ পর্দার আবরণে ঘেরা। কোষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল কোষ জীবনের সব প্রয়োজনীয় উপাদান একত্রে ধরে রাখে। যদি কোষের দেয়াল কোনো কারণে জীর্ণ হয়ে ধ্বসে যায় তাহলে কোষের মূল উপাদান বেরিয়ে পড়ে এবং কোষের মৃত্যু ঘটে। ঠিক যেমন যদি কোনো মানুষের উদর থেকে নাড়ীভুঁড়ি কেটে ফেলে দিই তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না।

পৃথিবীর আদিতে প্রচণ্ড তাপ আর ঘূর্ণিপাকে কিছু রাসায়নিক উপাদান একত্রিত হয়ে অবিকশিত কোষ গঠিত হয়। কোষের বাইরের পর্দার আবরণ এতই প্রয়োজনীয় যে প্রাণের উৎস সন্ধানী কিছু গবেষক যুক্তি দেখালেন যে, কোষ সৃষ্টির আগেই কোষের আবরণ সৃষ্টি হয়েছে। তারা মনে করতেন 'যেভাবে জীবনের শুরু' বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচিত "জীনতত্ত্ব প্রথম" এবং চতুর্থ অধ্যায়ের "বিপাক ক্রিয়া প্রথম" ধারণাগুলো বিভ্রান্তিকর। তাঁদের বিকল্প মতবাদটি ছিল "কোষের কাঠামো পৃথকীকরণ প্রথম" ঘটেছিল। এই মতবাদের পুরোধা ব্যক্তি হলেন ইটালির রোমে অবস্থিত রোমা ট্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিয়ের লুইগি লুইজি।

লুইজির মতবাদের সপক্ষে কারণ যথেষ্ট সহজ সরল হলেও ব্যাখ্যা করার জন্য এত সহজ ছিল না। কীভাবে আপনি প্রমাণ করবেন 'বিপাক ক্রিয়া' বা 'স্বয়ম্ভূ আরএনএ' মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব যদি একটা বিশেষ স্থানে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো যায়। অন্যথায় অণুজীব থেকে প্রাণ সঞ্চার হবে কোথায়?

যদি আপনি উপরের যুক্তি স্বীকার করে নেন তাহলে প্রাণ সৃষ্টির একটাই উপায় আছে সেটা হলো, যেকোনভাবে আদি পৃথিবীর উত্তপ্ত ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যেও প্রাণ সৃষ্টির কিছু কাঁচামাল একত্রিত হয়ে অবিকশিত কোষ বা প্রাথমিক কোষের জন্ম নেয়া। প্রতিকূলতা পেরিয়ে গবেষণাগারে এই তত্ত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীগণ গবেষণাগারেই একটা সরল এককোষী জীবন্ত কোষ বানানো সম্ভব করেছেন।

All living things are made up of cells

(Credit: Cultura Creative RF/Alamy)

লুইজি যেন তাঁর সব চিন্তার সাথে যোগসূত্র স্থাপনে ফিরে গেলেন অ্যালেক্সান্ডার ওপারিনের কাছে এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রাণের সৃষ্টি রহস্য গবেষণার ঊষালগ্নে। অ্যালেক্সান্ডার ওপারিনের গবেষণার বিষয় ইতিমধ্যে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ওপারিন গুরুত্বের সাথে দেখালেন কোয়াসারভেট থেকে উৎসারিত কিছু উষ্ণ রাসায়নিক তরলের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে যার কেন্দ্রে আছে কিছু অবিকশিত কোষের মত বস্তু। তিনি দাবী করেন কোয়াসারভেটগুলোই আসলে কোষের প্রথম নমুনা।

সঠিক উপাদান থাকার পরেও গবেষণাগারে কোষের প্রাথমিক নমুনা সৃষ্টি খুব কঠিন কাজ। যেকোনো চর্বিযুক্ত বা তৈলাক্ত বস্তু আছে এমন পানিতে ব্লব বা ফিল্ম সৃষ্টি হয় আর এইসব রাসায়নিক উপাদান একসাথে লিপিড নামে পরিচিত। আলোচনার এই পর্যায়ে বিজ্ঞানীগণ ধারণা পোষণ করতে থাকেন লিপিড থেকেই জীবনের প্রথম সূচনা। আমরা প্রাণের সৃষ্টি গবেষণায় বিজ্ঞানের এই মতবাদকে 'লিপিড ঘরানা' বলতে পারি।

কিন্তু শুধুই রাসায়নিক উষ্ণ ঘন তরলের ধারা সৃষ্টি করলেই সব সমাধা হয়ে গেল এমন নয় বিষয়টা। বিগত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করেও লুইজি এমনকিছু বানাতে পারলেন না যা দিয়ে তিনি বিজ্ঞানীদের সম্মতি অর্জনের জন্য জীবন-সদৃশ কিছু উপস্থাপন করা যায়। এখানে উল্লেখ্য উষ্ণ রাসায়নিক পানির প্রবাহের স্থিতিশীলতা থাকতে হবে এবং সেই প্রবাহ থেকে বিভাজিত হয়ে আর একটা ধারা সৃষ্টি করার সক্ষমতা থাকতে হবে। সেই ধারার মধ্যে কী কী উপাদান পরিবাহিত হচ্ছে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এতকিছু করতে হবে কিন্তু আধুনিক একটা কোষের পরিণত প্রোটিন ব্যবহার না করেই।

Somehow cells formed

(Credit: Christian Jegou/Publiphoto Diffusion/Science Photo Library)

এরপরে ১৯৯৪ সালে লুইজি এক সাহসী প্রস্তাবনা রাখলেন। তিনি বলেন প্রাথমিক পর্যায়ের কোষে অবশ্যই আরএনএ থাকতে হবে। তিনি আরও দাবী করেন এই আরএনএ অবশ্যই নিজের আর একটা প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে সম্ভব। লুইজির প্রস্তাবনা বিজ্ঞানের নতুন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দিলো। তার মানে হলো, প্রাণ বিকাশের প্রথম প্রস্তাবনায় আমরা আসলে প্রাণের সৃষ্টি রহস্য গবেষণার বিভিন্ন তত্ত্বের মিলন মেলায় মিলিত হয়েছি এবং দীর্ঘ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছি। লুইজির প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আমলে নিলে, প্রাণ বিকাশের প্রথম প্রস্তাবনা কম্পার্টমেন্টালাইজেশন তত্ত্ব বা কোষের বিভাজন তত্ত্বকে বাতিল করে দিতে হয়। কিন্তু লুইজির কাছেও উপযুক্ত কারণ ছিল।

ভিতরে জিন বিহীন চারপাশে আবৃত কোষ খুব বেশী কিছু করতে পারে না। হয়তো কোষ বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তারা নিজের বংশগতির কোনো তথ্য, উপাত্ত পরবর্তী কোষের মাঝে সঞ্চার করতে পারবে না। কোষ কেবল তখনি বিবর্তিত হতে শুরু করবে এবং ক্রমাগত জটিলতর হয়ে উঠতে পারবে যদি কোষের অভ্যন্তরে জিন থাকে।

এই তত্ত্ব খুব দ্রুত জ্যাক সোসটাকের সমর্থকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। আমরা ইতিমধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে সোসটাকের আরএনএ নিয়ে গবেষণা আলোচনা তুলে ধরেছি। যখন লুইজি ছিলেন কম্পার্টমেন্টালাইজেশন তত্ত্বের প্রথম দিকের সমর্থক ঠিক তখন সোসটাক সমর্থন করতেন জিনতত্ত্বকে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন কোন মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত ছিল না। আমরা প্রাণের সৃষ্টি রহস্য গবেষণার বিভিন্ন তত্ত্বের মিলন মেলায় মিলিত হয়েছি এবং দীর্ঘ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছি এবং সোসটাকের গবেষণার সূত্র ধরে নির্ধারণ করছে চাচ্ছি কোনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মোটের উপর আমরা বুঝতে পারলাম দুই গবেষণাতেই কোষের উপস্থিতি আছে। আমরা একটা সম্মতিতে এলাম যে প্রাণের উৎস সন্ধানে

কম্পার্টমেন্টালাইজেশন বা বিভাজন তত্ত্ব এবং জীনতত্ত্ব উভয় গবেষণাতেই কোষ খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।
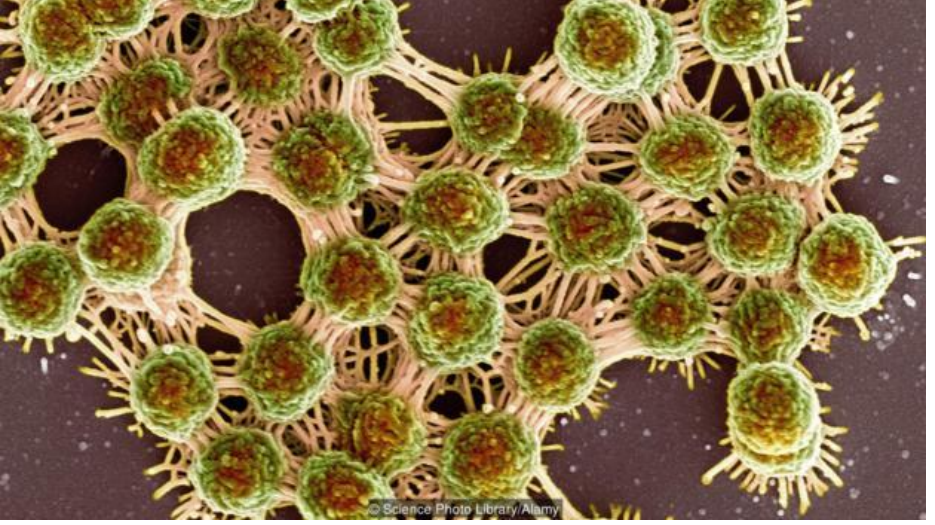
Almost all life is single-celled

(Credit: Science Photo Library/Alamy)

সোসটাকের তত্ত্ব প্রাণের উৎস গবেষণার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী এবং সোসটাক অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর গবেষণা তত্ত্বে অর্থ বিনিয়োগ করবেন যেখানে তাঁর আগ্রহ। কারণ হিসেবে বললেন, "এমন একটা তত্ত্বের সমর্থনে তত্ত্বকে গবেষণার বাইরে রাখতে পারি না।" তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রাথমিক কোষ দিয়ে গবেষণা শুরু করবেন। দুই বছর পরে সোসটাক এবং তার দুইজন সহকর্মী ২০০১ সালে বড় ধরণের সাফল্যের সুসংবাদ দিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত 'নেচার' জার্নালে তারা যুক্তি দেখিয়ে লিখলেন প্রকৃতিতে প্রাপ্ত আপাত বিচ্ছিন্ন উপাদান থেকে সহজেই প্রাথমিক কোষ সৃষ্টি করা সম্ভব। চর্বিযুক্ত তেলতেলে বস্তুর সংস্পর্শে আরএনএ নিজের নিজের প্রতিলিপি জন্ম দিতে পারে।
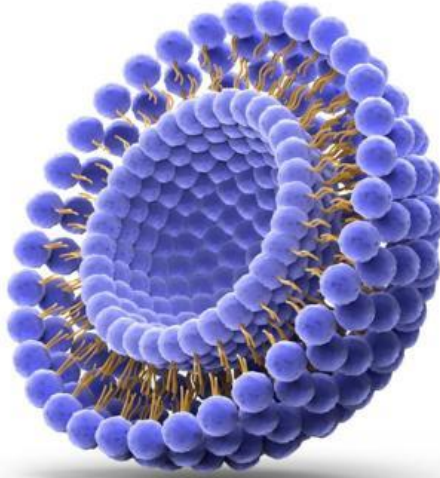
Vesicles are simple containers made of lipids

(Credit: Alfred Pasieka/Science Photo Library)

সোসটাক এবং তার গবেষক-দল কোষের ভেসিকল (কোষের তরল পূর্ণধারক) নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ভেসিকল দেখতে অনেকটা সর্পিল ঘন তরলের আকার যার গভীরে এবং বাইরের আবরণে দুইটা ফ্যাটি এসিডের স্তর আছে। ভেসিকলের উৎপাদন ত্বরান্বিত করার উপায় খুঁজতে গিয়ে সোসটাকের গবেষক-দল এলুমিনিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের জটিল যৌগের কাদার মত দেখতে থকথকে একটা বস্তুকে বিক্রিয়ার কাজে লাগিয়ে দিলেন এবং মনে করলেন এই নিরীক্ষা প্রাণ গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। এই যৌগের মিশ্রণ গবেষণা কাজে যোগ করার পরেই ভেসিকলের উৎপাদন ১০০ গুণ ত্বরান্বিত হয়ে গেল। কাদার মতো বস্তুর পৃষ্ঠতল ভেসিকল উৎপাদনে অনুঘটকের কাজ করে যে কাজটা সচরাচার এনজাইম করে থাকে।

তদুপরি, ভেসিকল এলুমিনিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের জটিল যৌগের কাদার কণা এবং কাদার পৃষ্ঠতল থেকে আরএনএ গ্রহণ করতে পারে। প্রথমদিকের

এইসব কোষ এখন বহন করছে জিন এবং অনুঘটক আর এতকিছু ঘটে যাচ্ছে একটা সরল কাঠামোর মধ্যে। তবে প্রাণ গবেষণার এই পর্যায়ে এলুমিনিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের জটিল যৌগের কাদা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত কিন্তু হঠাৎ করে নেয়া হয়নি। বিগত কয়েক দশক ধরে চলমান গবেষণার পরম্পরা গবেষকদলকে এই সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং তাঁরা অনুমান করেছিলেন প্রাণ সৃষ্টিতে এই যৌগ হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ।

© Susan E. Degginger/Alamy

This lump of clay is mostly montmorillonite

(Credit: Susan E. Degginger/Alamy)

এলুমিনিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ খুব সহজলভ্য। এখনকার সময়ে আমাদের ব্যবহার্য নিত্যদিনের জিনিসপত্রে এটা হরহামেশা ব্যবহৃত হয় এমনকি বিড়ালের বিছানা বানাতেও এটার ব্যবহার দেখা যায়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত ছাইয়ের ধুলো পৃথিবীর আবহাওয়াতে মিশে এই যৌগ সৃষ্টি হয়। যেহেতু পৃথিবীর শৈশবে অনেক আগ্নেয়গিরি ছিল সেহেতু এলুমিনিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ ছিল পরিমাণে বিপুল।

ফিরে যাই ১৯৮৬ সালে, তখন আমেরিকান রসায়নবিদ জেমস ফেরিস দেখালেন এলুমিনিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ আসলে অণুঘটক যা জৈব-কণা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আরও পরে তিনি আবিষ্কার করেন এলুমিনিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ আরএনএ সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে। এই দুইটি কাজের ওপর ভিত্তি করে জেমস ফেরিস ধারণা করেন গড়পড়তা দেখতে কাদার মতো এই যৌগটি আসলে প্রাণ সৃষ্টির উপাদান। জ্যাক সোসটাক ফেরিসের ধারণাকে গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং এলুমিনিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ ব্যবহার করে প্রথম কোষ সৃষ্টি করলেন। সোসটাক যুক্তি দেখালেন, আদি-কোষ যদি বেড়ে উঠতে পারে তাহলে সেটা বিভাজিতও হতে পারে। এক বছর পরে সোসটাকের গবেষক-দল প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, প্রথমদিকের কোষ নিজেদের মতো করেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে উঠতে পারে। এমনকি আদি-কোষে আরএনএ সংরক্ষিত থাকে এবং সময়ের হাত ধরে কোষের দেয়ালের বাইরের পাশ অতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন আদি-কোষ একটা ফুলে ওঠা পাকস্থলী এবং যেকোনো সময় সশব্দে ফেটে পড়বে। ফেটে পড়া রোধ করতে গিয়ে কোষ অধিকমাত্রায় ফ্যাটি এসিড গ্রহণ করে এবং তাদের সমন্বয়ে নিজের দেয়ালকে আরও মজবুত করে তোলে, ফলে কোষ ফুলে আকারে আর একটু বড় হয় এবং ফেটে পড়ার আশংকা দূর হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল আদি-কোষ যে কোষের আরএনএ কম তার থেকে ফ্যাটি এসিড গ্রহণ করছে ফলে সেই কোষগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তার মানে এ থেকে বোঝা যায় আদি-কোষ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল এবং যে কোষের আরএনএ বেশী স্বাভাবিকভাবে সে কোষ জিতে যায়। এই অনুসিদ্ধান্ত আমাদের মনে আরও বিস্ময় জাগায়। যদি আদি-কোষ বেড়ে ওঠতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের অনুরূপ কোষ সৃষ্টি করতে পারে তবে কি সোসটাকের গবেষণালব্ধ প্রাথমিক কোষ নিজের প্রতিলিপি বানাতে পারবে?
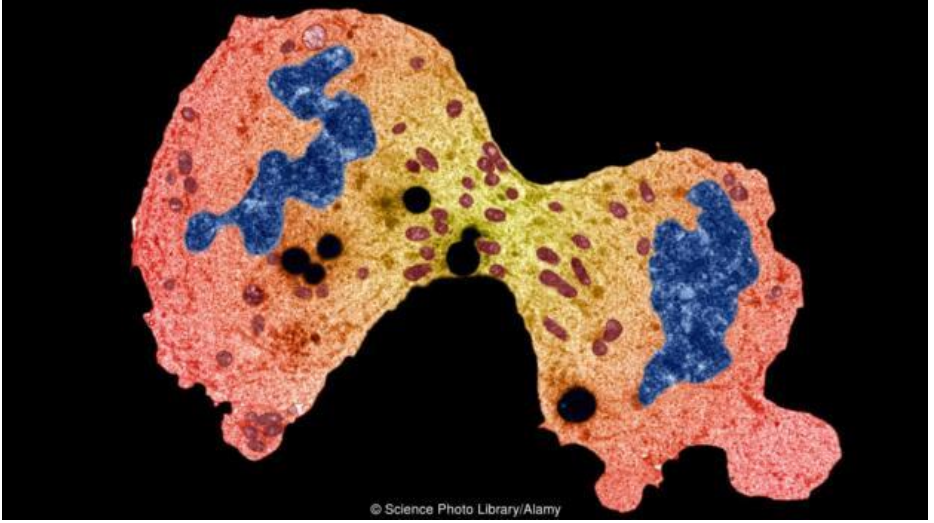
Cells reproduce by dividing into two
(Credit: Science Photo Library/Alamy)

সোসটাকের প্রথম পরীক্ষায় দেখানো হয়েছে কীভাবে আদি-কোষ বিভাজিত হয়। আদি-কোষকে দুমড়ে মুচড়ে যদি ছোট ছিদ্র পথের সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাহলে সেখান থেকে আদি-কোষ ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে। আদি-কোষ বেড়ে ওঠে, তাদের আকার পরিবর্তিত হয়, আয়তনে প্রসারিত হয় এবং তাদের শরীরে রশির মতো লম্বা পাতলা প্রান্ত দেখা যায়।

এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া একেবারে নির্ভেজাল কারণ এখানে কোষের কোন যান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম জড়িত নাই। এখানে শুধু চাপ প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু এটা কোন সমাধান নয় কারণ নিজেই নিজের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় আদি-কোষ তার নিজস্ব কিছু উপাদান হারায়। এছাড়াও আদি-কোষ তখনই বিভাজিত হতে পারে যখন ছোট ছিদ্রপথে বল প্রয়োগে প্রবেশ করানো হয়।

ভেসিকলকে বিভাজিত করার বিভিন্ন উপায় আছে যেমন কোষকে পানির প্রবল স্রোত যুক্ত করতে পারলে কোষে নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়। আদি-কোষের অভ্যন্তরীণ উপাদান বের হতে না দিয়ে কোষকে বিভাজন করার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হয়।

অবশেষে ২০০৯ সালে জ্যাক সোসটাক এবং তার সহযোগী ছাত্র টিং ঝু একটা সমাধান বের করতে সক্ষম হন। তাঁরা সামান্য একটু জটিল আদি-কোষ সৃষ্টি করলেন যার চতুর্দিকে একাধিক দেয়াল যেন অনেকটা পেয়াজের মত। সরল আদি-কোষের গঠনে জটিলতা থাকলেও সহজেই তাদেরকে সৃষ্টি করা সম্ভব। টিং ঝু যখন আদি-কোষের সাথে আরও বেশী ফ্যাটি এসিড যোগ করলেন তখন আদি-কোষের আকার পরিবর্তিত হয়ে গেল, সুতার মতো দেখতে প্রান্তগুলো আরও লম্বা হয়ে গেল। আদি-কোষের আকার যথেষ্ট বড় হয়ে গেলে অল্প চাপে আদি-কোষ ভেঙে বেশকিছু ছোট ছোট আদি-কোষে রূপান্তরিত হলো। পিতৃ-কোষের কোন আরএনএ কিন্তু হারিয়ে গেল না বরং প্রতিটি ক্ষুদ্র আদি-কোষ তার পিতৃ-কোষের আরএনএ বহন করতে লাগল। তাছাড়া, আদি-কোষ নতুন কোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া পৌনঃপুনিক ভাবে চালিয়ে যেতে পারে। নতুন আদি-কোষ পরিপূর্ণ হয়ে গেলে নিজেই আবার নতুন কোষে বিভাজিত হতে শুরু করে।

পরবর্তী পরীক্ষায় ঝু এবং সোসটাক আদি-কোষ ভেঙে নতুন কোষ জন্ম দেয়ার ভিন্ন ভিন্ন উপায় খুঁজে বের করতে পেরেছিলেন। গবেষণার এই পর্যায়ে মনে হচ্ছিল অবশেষে সমস্যার বুঝি সমাধান পাওয়া গেল।

যাই হোক আদি-কোষ কিন্তু তখন যথেষ্ট কার্যকরী ছিল না। লুইজি ভেবেছিলেন, আদি-কোষ আরএনএ প্রতিলিপি সৃষ্টির ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করবে কিন্তু যতদূর বোঝা যায় আদি-কোষে আরএনএ শুধু অলস বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ করে না।

সত্যিকার অর্থেই যদি আদি-কোষ থেকে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের বিকাশ প্রমাণ করতে হয় তাহলে সোসটাকের দেখাতে হবে আরএনএ কীভাবে কোষের অভ্যন্তরে নিজেই নিজের প্রতিলিপি জন্ম দেয়। কিন্তু এই তথ্যকে তত্ত্ব হিসেবে প্রমাণ করে দেখানো এত সহজ নয় কারণ দশকব্যাপী পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর পরেও কোন বিজ্ঞানী আরএনএ উৎপাদন করে দেখাতে পারেননি যা নিজেই নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে। ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বিশদ আলোচনা করে ফেলেছি। এই সমস্যার কারণেই প্রাণ বিকাশে আরএনএ তত্ত্ব ঘরানার গবেষণার কাজ প্রথমদিকে ব্যাহত হচ্ছিল এবং তখন পর্যন্ত কেউ এই সমস্যার সমাধান বের করতে পারেনি। সুতরাং সোসটাক লেসলি ওরগেলের গবেষণার ফলাফল ও লিখিত কাগজ পুনরায় পড়তে শুরু করেন। আমরা জানি লেসলি ওরগেল দীর্ঘদিন আরএনএ তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। পুরানো ধুলো পড়া কাগজের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল প্রাণের উৎস গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র।
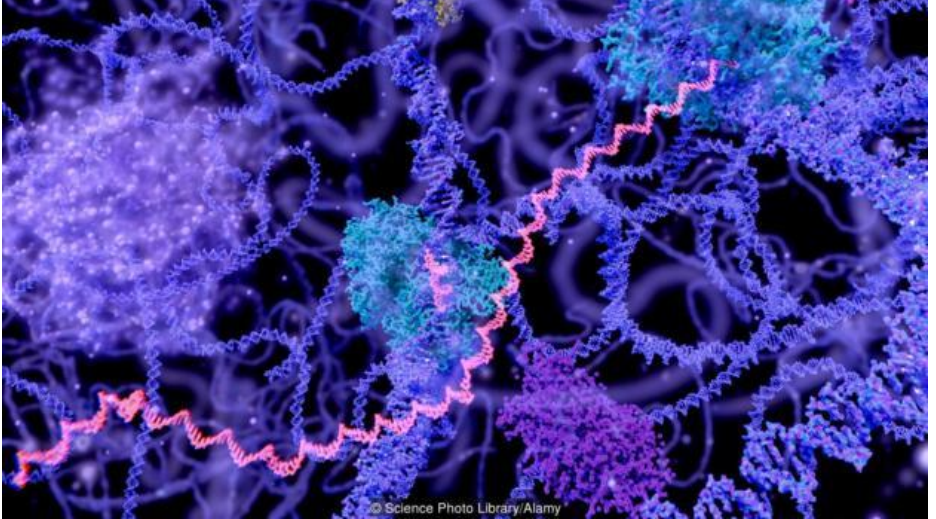
The first cells had to host the chemistry of life

(Credit: Science Photo Library/Alamy)

ওরগেল ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আরএনএ'র সুতোর মতো প্রান্তগুলো কীভাবে নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করে সেই গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ওরগেলের গবেষণার সারাংশ ছিল খুবই সহজ সরল এবং সাধারণ। আরএনএ'র সুতোর মতো একপ্রান্ত থেকে আলগা নিউক্লিওটাইড তুলে নেয়া হলো এবং তখন নিউক্লিওটাইড জড়ো করে আরএনএ'র প্রথম সুতোর মতো অবিকল আর একটা প্রান্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরি আরএনএ'র একটা সুতোর মতো প্রান্তে CGC লিখিত আছে এবং সেখানেই উৎপাদিত হয়েছে অনুরূপ আরেকটা সুতোর মত প্রান্ত যেটা পড়তে GCG এর মতো মনে হয়। সম্ভবত কেউ যদি এই প্রক্রিয়া দুইবার করে তবে প্রকৃত CGC পাওয়া যাবে।

ওরগেল বুঝতে পারলেন যে, কোনো অনুকূল পরিবেশে আরএনএ'র সুতোর মতো প্রান্ত একই প্রক্রিয়ায় এনজাইমের সাহায্য ছাড়াই আরএনএ'র প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে। সম্ভবত এভাবেই প্রথম প্রাণ আরএনএ থেকে জিন সংগ্রহ করত। ১৯৮৭ সালে ওরগেল আবিষ্কার করলেন, আরএনএ'র ১৪ লম্বা নিউক্লিওটাইড সুতোর প্রান্ত অনুরূপ ১৪ নিউক্লিওটাইড লম্বা প্রান্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি এর থেকে বেশী লম্বা আরএনএ'র প্রান্ত বানাতে পারেননি কিন্তু সোসটাকের চিন্তার সলতেই আগুন উস্কে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। সোসটাকের ছাত্রী ক্যাটারজিনা অ্যাডামালা আদি-কোষ সৃষ্টির জন্য পুনরায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা যে আদি-কোষ সৃষ্টি করলেন সেগুলো আগের কোষের গায়ের বাইরের সংলগ্ন মলিকিউল থেকে জিন বহন করে।

তাঁরা বুঝতে পারলেন, এই বিক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা এখানেই যে, ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতি আদি-কোষকে ধ্বংস করে। সব সমস্যারই সমাধান আছে এবং এই সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা হলো সাইট্রিক এসিড। লেবু, কমলা জাতীয় ফলে প্রচুর সাইট্রিক এসিড পাওয়া যায় এবং প্রতিটি জীবন্ত কোষে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাইট্রিক এসিডের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ২০১৩ সালে প্রকাশিত একটা গবেষণায় গবেষক-দল উল্লেখ করেন তাঁরা বিক্রিয়ার

সময় সাইট্রেট যুক্ত করে দেন ফলে বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ থেকে ম্যাগনেসিয়ামকে বিরত রাখা সম্ভব হয়। এতে আদি-কোষ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং কোষের প্রতিলিপি সৃষ্টির প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চলতে থাকে। সরলভাবে বলতে গেলে গবেষক-দল ১৯৯৪ সালে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী পিয়ের লুইগি লুইজির প্রস্তাবিত তত্ত্বকে বাস্তবায়ন করলেন। জ্যাক সোসটাক বলেন, "আমরা কোষের ফ্যাটি এসিডে ভেসিকলের অভ্যন্তরে আরএনএ'র অবিকল প্রতিলিপি সৃষ্টির রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করলাম।"

Szostak's protocells can survive extreme heat

(Credit: Jon Sullivan, PDPhoto.org)

মাত্র এক দশকের বেশী কিছু সময়ের গবেষণায় জ্যাক সোসটাকের গবেষক-দল প্রাণের উৎস সন্ধানে যুগান্তকারী অর্জন সম্পন্ন করে ফেললেন। তাঁরা আদি-কোষ বানাতে সক্ষম হলেন যারা পূর্বের কোষের জীন বহন করে এবং কোষের বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় মলিকিউল সংগ্রহ করতে পারে। এই আদি-কোষ নিজেরাই নিজেদের বৃদ্ধি এবং বিভাজন করতে পারে এমনকি নিজেদের মাঝে প্রতিযোগিতা

পর্যন্ত করতে পারে। আর কোষের অভ্যন্তরে চলতে থাকে আরএনএ'র অবিকল প্রতিলিপি সৃষ্টির অবিরাম কর্মযজ্ঞ। যেকোনো বিচারেই এই প্রক্রিয়া নতুন জীবন সৃষ্টির সূচনা বলা যেতে পারে। এতকিছু সত্বেও সোসটাকের গবেষণার ফলাফল প্রায় ৪০ বছর ধরে চলমান প্রাণের উৎস গবেষণার বিপরীতে চলে গেল। কোষের নিজেই নিজেকে জন্ম দিয়েছিল প্রথমে এই মতবাদকে প্রাধান্য না দিয়ে অথবা কোষের বিভাজন প্রক্রিয়াকে অধিক গুরুত্ব না দিয়ে সোসটাক এই দুই মতবাদের সমন্বয় সাধন করে বলতে চেয়েছিলেন এই দুই প্রক্রিয়া সমান-তালে একসাথে চলছিল। কিন্তু সোসটাকের গবেষক-দল যেকোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। ২০০৮ সালে সোসটাকের গবেষক-দল বুঝতে জানতে পারলেন, আদি-কোষ প্রায় ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও দিব্যি টিকে থাকতে পারে অথচ এই পরিমাণ উচ্চ তাপমাত্রায় বর্তমান সময়ের পরিণত বেশীরভাগ কোষেরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা। ফলে সোসটাকের ধারণা আরও জোরালো হয় যে আদি-কোষের সাথে প্রথম প্রাণের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এর থেকে আরও প্রমাণিত হয় অবিরাম চলতে থাকা উল্কা পতনের প্রভাবে সৃষ্ট গরমেও আদি-কোষ বহাল তবিয়তে টিকে ছিল।

জার্মানির ওসনাব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শিক্ষক আরমেন মালকিদজানিয়ান সোসটাকের গবেষণাকে অতুলনীয় হিসেবে অভিহিত করেন। সোসটাকে তত্ত্বাবধানে ইতিপূর্বে বর্ণিত দুই মতবাদের সমন্বয় করার প্রচেষ্টা প্রাণের উৎস গবেষণায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় যার কারণে শুরু হয় প্রাণ কীভাবে কাজ করে তার আলোচনা। এই 'সবকিছু প্রথমে' ধারণা ইতিমধ্যে জোগাড় করে ফেলেছে তথ্য প্রমাণের আকরিক সম্পদ এবং প্রাণের উৎস গবেষণার চলমান বিতর্কের সম্ভাব্য সমাধান।

ষষ্ঠ অধ্যায়
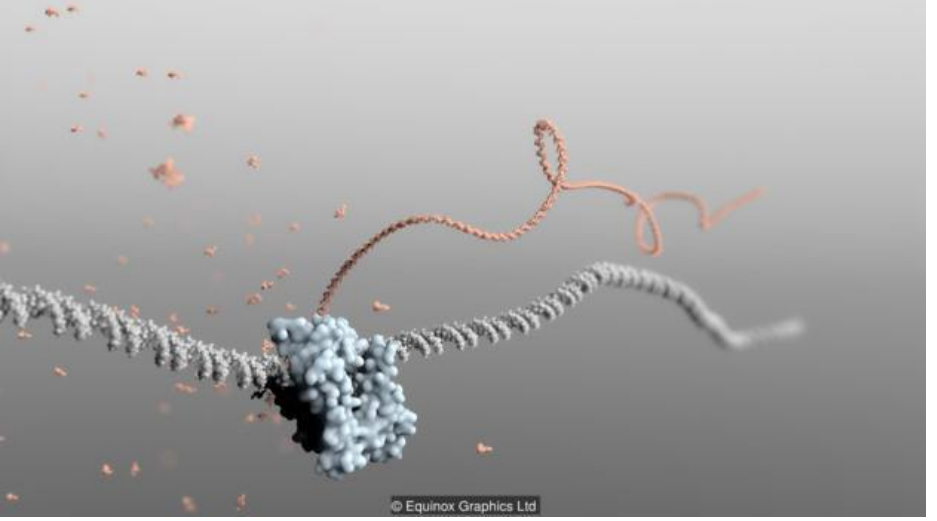
The molecules of life behave in incredibly complex ways
(Credit: Equinox Graphics Ltd)

সব পথ এসে মিলে গেল শেষে

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে প্রাণের উৎস সন্ধানী বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন তত্ত্বে ভাগ হয়ে তাঁদের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিটি বিজ্ঞানীদল তাঁদের নিজস্ব চিন্তার সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করছিলেন কিন্তু বেশিরভাগ যুক্তিই ছিল আকাশকুসুম অনুমানের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। যদিও এই প্রক্রিয়া বেশ কাজে দিয়েছিল এবং আগের অধ্যায়গুলোর পাঠ প্রমাণ করে সফলতাও এসেছিল কিছু কিন্তু প্রাণ বিকাশের প্রতিটি সম্ভাবনাময় ধারণা বা অনুমান শেষ পর্যন্ত আর একটি বড় প্রশ্ন এবং সীমাবদ্ধতার

জন্ম দেয়। একারণেই এবার কিছু গবেষক একত্র হয়ে যৌথভাবে প্রাণ বিকাশের এতদিনের অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করলেন।

প্রাণ বিকাশের উৎস সন্ধানে একত্রিত কাজ করার প্রয়াস কয়েক বছর আগে বেগবান হয়। একত্রে কাজ করার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীগণ ইতিপূর্বের বহুল চর্চিত "আরএনএ প্রথম নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করেছিল" মতবাদের ওপর কাজ শুরু করেন। কিন্তু ২০০৯ সালে আরএনএ ঘরানার বিজ্ঞানীগণ আবার একটি বড় ধরণের সমস্যার মুখে পড়ে গেলেন। পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে ঠিক কীভাবে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল তার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের মতবাদের সপক্ষে প্রাণের মৌলিক উপাদান আরএনএ'র নিউক্লিওটাইড সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলেন। এই আলোচনার তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা যেটা পড়েছি সেখানে দেখতে পাই, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের বিকাশ মোটেও আরএনএ থেকে সৃষ্টি হয়নি। ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক জন ডেভিড সুদারল্যান্ড ১৯৮০ সাল থেকে আরএনএ থেকে প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল কিনা এই সমস্যা অথবা সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। জন ডেভিড সুদারল্যান্ড বলেন, "আমি মনে করি, আপনি যদি প্রমাণ করে দেখাতে পারেন, আরএনএ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে সক্ষম তাহলে সেটা হবে অসাধারণ এক কাজ।" কিছুদিন পরেই সুদারল্যান্ড যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির মলিকিউলার বায়োলজি ল্যাবরেটরিতে গবেষণার চাকরি পান। বেশিরভাগ গবেষণা প্রতিষ্ঠানই গবেষকদলকে নতুন উদ্ভাবনে ক্রমাগত চাপের মুখে রাখে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মলিকিউলার বায়োলজি ল্যাবরেটরি কখনো কাজের জন্য চাপ দেয় না। সুতরাং সুদারল্যান্ড কৃত্রিমভাবে আরএনএ নিউক্লিওটাইড সৃষ্টি করা এত দুরূহ কেন সেটা নিয়েই গবেষণা শুরু করলেন এবং বছরের পর বছর পার করে দিলেন কীভাবে বিকল্প উপায়ে আরএনএ সৃষ্টি করা যায়। তার গবেষণার ফলাফল বিদ্যুৎ গতিতে প্রাণ সৃষ্টির নতুন ধারণা সৃষ্টি করে এবং তিনি মন্তব্য করলেন, প্রাণের সমস্ত মৌলিক উপাদান পৃথিবীর প্রথমদিকে একসাথে তৈরি হয়েছিল।

Earth is the only place where we have found life
(Credit: Nasa)

জন সুদারল্যান্ড বলেন, "আরএনএ'র কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঠিকঠাক কাজ করে না। প্রতিটি আরএনএ নিউক্লিওটাইডের মূলাধারের উপাদান শর্করা এবং ফসফেটে তৈরি। কিন্তু গবেষণাগারে প্রমাণিত হয়েছে যে, আরএনএ'র মূল উপাদানের সাথে শর্করাকে মেলানো সম্ভব নয়, কারণ মলিকিউলের বেমানান আকার শর্করাকে মিশতে বাধা দেয়।" সুদারল্যান্ড আরও মনে করেছিলেন, প্রাণ সৃষ্টিতে আরএনএ খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও আরএনএ একমাত্র এবং শেষ উপাদান নয়।

সুতরাং সুদারল্যান্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদান দিয়ে আরএনএ নিউক্লিওটাইড সৃষ্টি করার জন্য গবেষণা শুরু করলেন। যথারীতি তার গবেষকদল ভিন্ন ধরণের শর্করা এবং সায়ানাইডের যৌগ সিনামাইডসহ পাঁচটি সাধারণ মলিকিউল দিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। গবেষক দলটি উপাদানগুলোকে কয়েক ধাপের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য

দিয়ে পরিচালিত করলেন ফলশ্রুতিতে দুইটা মলিকিউল থেকে চারটা আরএনএ নিউক্লিওটাইড উৎপন্ন হলো। এখানে উল্লেখ্য এই গবেষণায় শর্করা উৎপাদিত হলো না। এই গবেষণা প্রাণের বিকাশ অনুসন্ধানে অভাবনীয় সাফল্য এনে দিলো এবং জন ডেভিড সুদারল্যান্ডের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল।

অনেক পর্যবেক্ষক সুদারল্যান্ডের গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে আরএনএ ঘরানার বিতর্কের আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলে দিলো। কিন্তু সুদারল্যান্ড নিজে পর্যবেক্ষকদের ব্যাখ্যার সাথে একমত ছিলেন না। আরএনএ ঘরানার ঐতিহাসিক বিতর্ক এবং অনুমান বলছে, প্রথম অণুজীবের অভ্যন্তরে প্রাণের স্পন্দনের সব কাজ সম্পাদনা করে আরএনএ। কিন্তু সুদারল্যান্ড আরএনএ ঘরানার গবেষক, পর্যবেক্ষকদের সেই ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে বলেন, তাদের মতামত 'হতাশাজনক উচ্চাকাঙ্ক্ষা' সুদারল্যান্ড আরএনএ ঘরানার বিতর্ক পরিহার করে ইতোমধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত জ্যাক সোসটাকের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 'আরএনএ প্রথম নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে' এবং ইটালির বিজ্ঞানী পিয়ের লুইগি লুইজি প্রস্তাবিত 'প্রাণ প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল ধাপে ধাপে' এই দুই তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় এবং একত্রিত করে গবেষণা শুরু করলেন। কিন্তু সুদারল্যান্ড প্রাণ বিকাশের ব্যাখ্যা শুরু করলেন আরও আগে থেকে এবং তিনি প্রকাশ করলেন, "প্রাণের সবকিছুই একবারে প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি হয়েছিল।" তিনি চেষ্টা করলেন পারস্পরিক সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন উপাদান থেকে একবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষ সৃষ্টি করতে। তাঁর প্রথম সূত্র নিউক্লিওটাইডের সংশ্লেষণ ছিল কিছুটা বেমানান কিন্তু যেটাকে শুরুতে মনে হয়েছিল আনুষঙ্গিক।
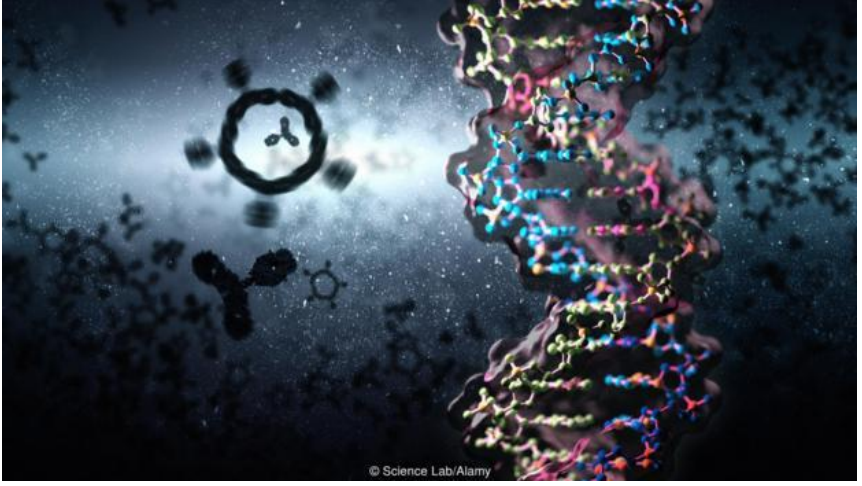
Life needs a wide mix of chemicals

(Credit: Science Lab/Alamy)

সুদারল্যান্ডের কর্মপ্রক্রিয়ার শেষ ধাপে সুদারল্যান্ড নিউক্লিওটাইডে ফসফেট যুক্ত করে দেন। কিন্তু তিনি গবেষণায় যা পেলেন তা হলো বিক্রিয়ার শুরুতেই ফসফেট মিশিয়ে দিলে সর্বোৎকৃষ্ট ফলাফল পেতে পারতেন কারণ এতে নিউক্লিওটাইডের প্রাথমিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এরকম পরিস্থিতিতে বিক্রিয়ার জন্য ফসফেট অত্যাবশ্যকীয় হলেও কাজটি ছিল খুব ঝামেলাপূর্ণ কিন্তু সুদারল্যান্ড বিক্রিয়াকালীন সমস্যার মাঝেই দেখতে পেলেন দারুণ সম্ভাবনা। বিক্রিয়াতে ফসফেটের মিশ্রণ যথেষ্ট জটিল এবং মনে করা হচ্ছিল প্রাণ সৃষ্টির সব উপাদান একই সময়ে উৎপাদিত হয়েছিল। এই চিন্তা থেকেই সুদারল্যান্ড ভাবতে শুরু করলেন ফসফেটের মিশ্রণটি ঠিক কতটা জটিল এবং ঝামেলাপূর্ণ হতে পারে। পৃথিবীর শৈশবকালে পৃথিবীতে অবশ্যই শত শত রকমের রাসায়নিক উপাদানের একত্রে উপস্থিতি ছিল এবং এদের মিশ্রণে তৈরি হয়েছিল তরল গাদ বা কাদামাটির মত বস্তু এবং সেগুলো যথাসম্ভব পরস্পর বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। ১৯৫০ সালে স্ট্যানলি মিলার ঠিক একই ধরণের কাদার মিশ্রণ বানিয়েছিলেন যা আমরা ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হতে দেখেছি। স্ট্যানলি মিলারের কাদার মিশ্রণ ছিল সুদারল্যান্ডের মিশ্রণ থেকেও ঘন। কাদার মধ্যে ছিল

অণুজৈবিক মলিকিউল কিন্তু সুদারল্যান্ড বলেন, “কাদার মিশ্রণের মধ্যে প্রচুর অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান মিশে ছিল যাদের বেশিরভাগই অজৈবিক।”

সুদারল্যান্ডের নতুন গবেষণার অর্থ দাঁড়ায় মিলারের গবেষণা পদ্ধতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ ছিল না। বরং মিলারের গবেষণার প্রক্রিয়া ছিল খুবই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ফলে উপকারী রাসায়নিক উপাদানগুলো মিশ্রণের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং সুদারল্যান্ড পৃথিবীর আদি অবস্থায় কী কী রাসায়নিক উপাদান “গোল্ডিলকস কেমিস্ট্রি” খোঁজার জন্য অনুসন্ধান করেন এবং তিনি দেখতে পেলেন যেসব উপাদান বিশৃঙ্খলা ঘটায় না তারা বিক্রিয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয়, তদুপরি তারা এত সাধারণ এবং সংখ্যায় এত কম যে বিক্রিয়াতে প্রভাব বিস্তার করার মতও নয়। সুতরাং সেইসব রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণ যথেষ্ট জটিল বলেই তাদের দ্বারা হয়ত একদা প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল এবং পরে তারা একত্র হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যেতে পারে চার বিলিয়ন বছর আগেকার আমাদের পৃথিবীটা ছিল উত্তপ্ত পুকুরের মতো এবং সেই শৈশবের পৃথিবী সেভাবেই পতিত অবস্থায় ছিল বছরের পর বছর রাসায়নিক উপাদানগুলো প্রাণের বিকাশের জন্য উপযোগী হওয়ার অপেক্ষায়। তারপর একসময়ে ধীরে ধীরে প্রথম প্রাণের স্পন্দন দেখা দিতে শুরু করে।

A handful of chemicals is not enough to make life

(Credit: JG Photography/Alamy)

মনে হতে পারে এ-তো অসম্ভব, যেমন-ভাবে মধ্য যুগের রসায়নবিদেরা বলতেন পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির অলীক গল্প। তবে সুদারল্যান্ডের তথ্য ও প্রমাণ কিন্তু ক্রমেই গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল। ২০০৯ সাল থেকেই তিনি দেখাচ্ছেন, একই রাসায়নিক উপাদান যা তার গবেষণার জন্য দুইটা আরএনএ নিউক্লিওটাইড সৃষ্টি করেছিল তারাই অণুজীব প্রাণের উপাদান সৃষ্টিতে সমান ভূমিকা রাখতে পারে।

তাহলে অবশ্যই পরের পদক্ষেপ হবে আরও বেশি আরএনএ নিউক্লিওটাইড উৎপাদন করা। যদিও তিনি অধিক পরিমাণে নিউক্লিওটাইড সৃষ্টি করতে পারলেন না কিন্তু তিনি ২০১০ সালে প্রায় একই ধরণের অণুজীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং তাদের থেকে সম্ভাব্য নিউক্লিওটাইড উৎপাদন করতে সক্ষম হন। একইভাবে ২০১৩ সালে সুদারল্যান্ড অ্যামিনো এসিডের মূল উপাদান সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এ-পর্যায়ে তিনি গবেষণায় বিক্রিয়া সুসম্পন্ন করতে আগের রাসায়নিক উপাদানের সাথে কপার সায়ানাইড যুক্ত করে দেন।

সায়ানাইডের সাথে সম্পৃক্ত রাসায়নিক উপাদানে প্রাণের কিছু সাধারণ বিষয়ের প্রমাণ উঁকি দিয়ে যায় এবং ২০১৫ সালে সুদারল্যান্ড সায়ানাইডযুক্ত রাসায়নিক উপাদান নিয়ে পুনরায় গবেষণা করতে মনোনিবেশ করেন। গবেষণায় তিনি দেখালেন একই রাসায়নিক মিশ্রণও প্রাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লিপিড সৃষ্টির পূর্বশর্ত যা মলিকিউল কোষের দেয়াল তৈরি করে। সুদারল্যান্ডের সব গবেষণার রাসায়নিক বিক্রিয়া অতিবেগুনি আলোর প্রতিফলনে সম্পন্ন করা হয় এবং বিক্রিয়াতে ব্যবহার করা হয় গন্ধক এবং বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে ব্যবহৃত হয় তামা।

Life needs a rich cocktail of chemicals to form

(Credit: Radius Images/Alamy)

জ্যাক উইলিয়াম সোসটাক বলেন, “প্রাণ বিকাশের প্রতিটি উপাদান মূলত বিশেষ কিছু অনন্য কিন্তু সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলাফল।” গবেষণার প্রক্রিয়া খুব পরিষ্কার। যদি সুদারল্যান্ডের গবেষণা সঠিক হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে গত চল্লিশ বছর ধরে প্রাণের উৎস সন্ধানে যে গবেষণা চলমান সেটা ভুলভাবে চলছিল। এতদিনের জিজ্ঞাস্য কোষের জটিলতার কিছুটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আদি কোষ কীভাবে ধীরে ধীরে গঠিত হয়েছিল পূর্বোক্ত ধারনার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করতে লাগলেন। সুদারল্যান্ড আরও বললেন, “আরএনএ প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল লেসলি ওরগেল’র এমন প্রস্তাবনার পরে গবেষকগণ প্রাণের বিকাশের একেকটি অধ্যায় উন্মোচন করার চেষ্টা করছিলেন এবং পরের স্তর আবিষ্কারের পিছনে ছুটছিলেন অদম্য কৌতূহলে।” কিন্তু সুদারল্যান্ড মনে করলেন, প্রাণের উৎস অনুসন্ধানের সবচেয়ে ভাল উপায় হলো খুঁজে দেখা প্রাণের সব উপাদান একইসাথে সৃষ্টি হয়েছিল কী না সেটা আগে দেখা। প্রাণ সৃষ্টির সব মৌলিক উপাদানই একবারেই সৃষ্টি করা সম্ভব বলে

সুদারল্যান্ড মনে করেন। আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো একই সাথে প্রাণের সব উপাদান সৃষ্টি হয়েছিল এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা।

সোসটাক সন্দেহ করছিলেন, প্রাণ সৃষ্টির অন্যতম মূল উপাদান মলিকিউল সৃষ্টি এবং উপাদানগুলোকে একত্র করে জীবন্ত কোষে পরিণত করার দুইটা গবেষণাকর্ম একই কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় গবেষণায় সেটা খুব পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। সোসটাক বলেন, "প্রথম বড় অণুজীবের সাথে আরএনএ'র ভীষণ সাদৃশ্য আছে বলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম"। বিজ্ঞানীগণ প্রথম দিকে তাঁদের পছন্দের খুব সামান্য কিছু রাসায়নিক উপাদান নিয়ে গবেষণা করতেন এবং পৃথিবীর প্রথমদিকে বিদ্যমান অন্যান্য সব রাসায়নিক উপাদানকে গবেষণার বাইরে রেখেছিলেন। কিন্তু সুদারল্যান্ডের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে প্রাণের উৎস সন্ধানের রাসায়নিক বিক্রিয়াতে কিছু নতুন বা অতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদান যোগ করলে বিক্রিয়ার ফলাফলে আরও বৈচিত্রতা এবং বহুমাত্রিকতা সৃষ্টি করা সম্ভব। ২০০৫ সালে আদি কোষ সৃষ্টির প্রয়াসে আরএনএ এনজাইমের উপস্থিতিতে সোসটাক নিজেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় অতিরিক্ত কিছু রাসায়নিক উপাদান যুক্ত করে গবেষণা করেন। আদি কোষের চারিদিকের পাতলা ঝিল্লির মত আবরণ ভেদ করতে এনজাইমের ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন ছিল।

অতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদান যুক্ত করার ফলাফল ছিল বিস্ময়কর। নির্ভেজাল ফ্যাটি এসিড থেকে ভেসিকল সৃষ্টির পরিবর্তে বিজ্ঞানীগণ রাসায়নিক যৌগের দুটি মিশ্রণ থেকে ভেসিকল সৃষ্টি করলেন। এই নতুন জটিল যৌগের ভেসিকল ম্যাগনেসিয়ামের সাথে টিকে থাকতে পারে এবং তার মানে হল আরএনএ এনজাইমের উপস্থিতিতে তারা স্বচ্ছন্দে বিরাজ করতে পারে। সোসটাক আরও বলেন, প্রথম জিন সম্ভবত এই সময়ে জটিল হতে শুরু করে।
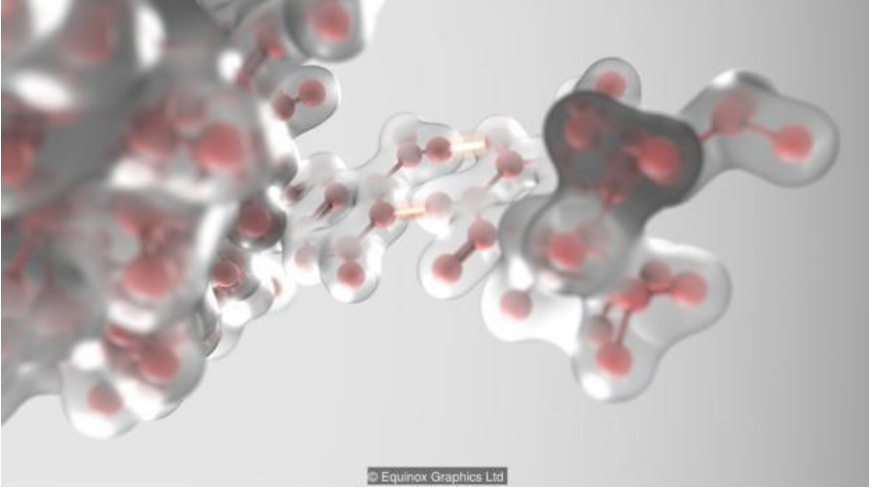
DNA is made up of smaller molecules called nucleotides

(Credit: Equinox Graphics Ltd)

আধুনিক অণুজীব তাদের জিনে নির্ভেজাল ডিএনএ বহন করলেও প্রথমদিকে সম্ভবত নির্ভেজাল ডিএনএ'র অস্তিত্ব ছিল না। তারা সম্ভবত আরএনএ এবং ডিএনএ নিউক্লিওটাইডের জটিল মিশ্রণ ছিল। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রথমদিকে নির্ভেজাল ডিএনএ বা আরএনএ সৃষ্টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ২০১২ সালে সোসটাক দেখালেন, আরএনএ এবং ডিএনএ নিউক্লিওটাইডের জটিল মিশ্রণ 'মোজাইকে'র মতো দেখতে মলিকিউল একত্র করতে সক্ষম এবং তাদের আচার আচরণ প্রায় আরএন'র মতোই। এই আরএনএ এবং ডিএনএ নিউক্লিওটাইডের জটিল মিশ্রণের শিকল জালের মতো ভাঁজে ভাঁজে বিস্তৃত। কিন্তু একটা সমস্যার নিদান সুদারল্যান্ড বা সোসটাক কেউই দিতে পারেননি এবং সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। প্রথম অণুজীবের অবশ্যই যেকোনো ধরণের বিপাক ক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল। যেখান থেকেই শুরু হোক না কেন জীবনকে অবশ্যই শক্তি আহরণ এবং গ্রহণ করতে হয় তা না হলে কোষের বেঁচে থাকার কোন আশা নাই।

পরীক্ষাগারে উৎপাদিত আরএনএ'র সামনে বিকল্প আরও পথ খোলা ছিল ঠিক যেমনটা টিএনএ বা পিএনএ'র ক্ষেত্রে ঘটেছিল (তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে আমরা আগেই জেনেছি)। আমরা জানি না আরএন, ডিএনএ, টিএনএ বা পিএনএ পৃথিবীতে আদৌ বিদ্যমান ছিল কিনা কিন্তু যদি তাদের উপস্থিতি থাকত তবে প্রথম অণুজীবও আরএনএ ছাড়াও অন্য কোনো আমিষ ব্যবহার করত। কিন্তু বাস্তবে এটা কোনো আরএনএ ঘরানার বিজ্ঞান নয়; এই বিজ্ঞানের ক্রমাগত তর্ক, গবেষণা, পরীক্ষা হলো এলোপাতাড়ি বিতর্কের 'জগাখিচুড়ি'।

এই কয়েক অধ্যায়ের আলোচিত প্রাণের উৎস সন্ধানে পাঠ করে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে প্রাণের প্রথম কোষ সৃষ্টিকে প্রথমদিকে যত জটিল কঠিন মনে হয়েছিল বাস্তবে ততোটা নয়। কারণ, বিজ্ঞানীগণ এখন জেনে গেছেন, কোষ নিজেই নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারার এক অদ্ভুত দক্ষ স্বয়ংক্রিয় কারখানা। কিন্তু এখন এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে কোষ এখনো নিয়মিত তাদের প্রতিলিপি সৃষ্টি করছে। যদিও পূর্বের প্রক্রিয়ার মধ্যে এখন বিস্তর ফারাক রয়েছে। কোষের কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়েই তারা ক্রমাগত দ্রুত ঘুরছে আর নিজেদের প্রতিলিপি বানিয়ে যাচ্ছে। কিছু কোষ ছিল যারা অলস এবং কদাকার, তারা প্রথমদিকের পৃথিবীতে টিকে থাকা যুদ্ধে টিকে থাকতে পারেনি। হয়ত সেই কারণেই সেই কোষগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, বহিঃশত্রুর আক্রমণের কোনো ভয় ছিল না। সুতরাং বিভিন্ন দিক বিবেচনায় আনলে মনে হয় বর্তমানের তুলনায় আদিকালের জীবন অনেক সহজ সরল ছিল। সেই সূত্র ধরেই যদি আর কিছু বিবেচনা না করি তাহলে দেখবো, এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচিত মাইক রাসেল, বিল মার্টিন এবং অন্যান্য কিছু বিজ্ঞানীগণের 'বিপাক ক্রিয়া' প্রথম এই তত্ত্বের সাথে সুদারল্যান্ড একাত্বতা ঘোষণা করছেন। সুদারল্যান্ড বলেন, "আরএনএ ঘরানার বিজ্ঞানীগণ যখন'বিপাক ক্রিয়া' প্রথমে উদ্ভূত হয়েছে এমন ধারণা পোষণকারী বিজ্ঞানীদের সাথে বিজ্ঞানের তর্কযুদ্ধ থাকলেও তাদের দুপক্ষেরই পর্যাপ্ত কারণ, যুক্তি আছে।"

Earth was pounded by meteors in its early years

(Credit: Chris Butler/Science Photo Library)

সোশটাক বলেন, "আদি-কোষের অবশ্যই যেকোনো প্রকারেই হোক না কেন বিপাক ক্রিয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার শক্তির উৎস কোথায় সেটাই হতে যাচ্ছে বিজ্ঞান-সভার পরবর্তী সবচেয়ে বড় প্রশ্ন"। এমনকি যদি মার্টিন এবং রাসেলের তত্ত্ব "প্রাণের সূচনা হয়েছিল সমুদ্রের গভীরে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ হওয়া লাভা মিশ্রিত খনিজ পানিতে" এমন তত্ত্ব ভুল হয় তবুও প্রাণ বিকাশের প্রাথমিক উপাদানগুলো অবশ্যই সেই পরিবেশেই ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, কারণ প্রাণের বিকাশের অন্যতম উপাদান ধাতু এবং খনিজ।
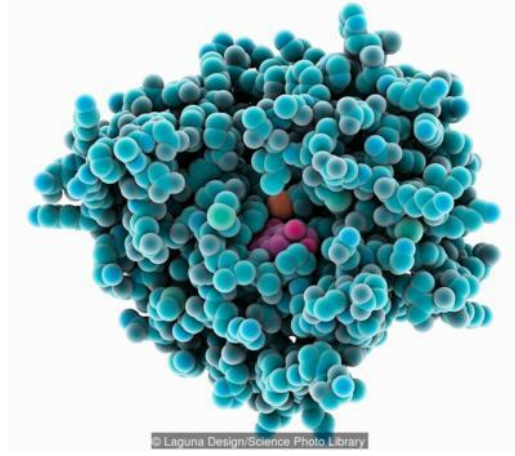
This enzyme has a metal ion at its core

(Credit: Laguna Design/Science Photo Library)

প্রাকৃতিকভাবেই অনেক এনজাইমের কেন্দ্রে ধাতুর মৌল পাওয়া যায়। অনেক সময় ধাতব অংশটাই এনজাইমের সবথেকে সচল এবং কর্মক্ষম অংশ আর মলিকিউলের বাদবাকি কাঠামো কোষের সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত। প্রথমদিকের প্রাণের এত জটিল এবং উন্নত এনজাইম ছিল না বরং প্রথম প্রাণে সম্ভবত আবরণবিহীন ধাতু প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে জার্মান বিজ্ঞানী গুনটার ভাসটারশাওজার দাবি করেন সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা থেকে প্রাণের উৎপত্তি হতে পারে না বরং তিনি সুপারিশ করেন প্রাণের সূচনা হয়েছিল লোহার আকরিকের উপর। একইভাবে রাসেল জোর দাবি তোলেন যেহেতু সমুদ্রের গভীরে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ হওয়া লাভামিশ্রিত গরম পানিতে প্রচুর পরিমাণ ধাতব খনিজ ছিল এবং সেগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করত সুতরাং সেখানেই প্রাণের বিকাশ সম্ভব। এদিকে মার্টিন তাঁর গবেষণায় দেখান পৃথিবীতে প্রাপ্ত সব প্রাণীর সাধারণ আদি-কোষ পাওয়া গেছে লোহার এনজাইমের উপর এবং তাদের পরিমাণও বিশাল। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, সুদারল্যান্ডের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো তামা এবং ক্ষেত্রবিশেষে গন্ধকের ওপর নির্ভর করতে হয়। ভাসটারশাওয়ার নিজেও

বিক্রিয়াতে গন্ধকের নির্ভরতার ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং সোসটাকের আদি-কোষের আরএনএ’র জন্য ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন হয়।

তবুও সমুদ্রের গভীরে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ হওয়া লাভা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সোসটাক বলেন,“কেউ যদি আধুনিক কোষের বিপাক ক্রিয়ার দিকে তাকায় তাহলে কোষে লোহা এবং গন্ধকের মিশ্রিত উপস্থিতি লক্ষ করতে পারবে। প্রাণের যাত্রা শুরু হয়েছিল সমুদ্রের তলদেশের আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার আশেপাশে এই তত্ত্বীয় ধারণার সাথে সোসটাকের দাবি অনেকাংশেই মিলে যায়, কারণ সমুদ্রের তলদেশের আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের উত্তপ্ত পানিতে প্রচুর পরিমাণে লোহা এবং গন্ধকের খনিজ পাওয়া যায়। যদি সুদারল্যান্ড এবং সোসটাকের তত্ত্বীয় ধারণা সঠিকও হয় তবুও সমুদ্রের তলদেশের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে প্রবাহিত উত্তপ্ত পানিতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে এমন ধারণা ভুল, কারণ হিসেবে বিরোধী পক্ষের বিজ্ঞানীগণ বলছেন, “গভীর সমুদ্রে কখনো প্রাণের বিকাশ সম্ভব নয়।”

Perhaps life began in a shallow sea

(Credit: ArteSub/Alamy)

সুদারল্যান্ড বলেন, “আমরা যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার রহস্য উন্মোচন করলাম সেটা অতিবেগুনী রশ্মির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। সূর্যই হলো অতিবেগুনী রশ্মি

বিকিরণের একমাত্র উৎস। সুতরাং পৃথিবীর প্রথমদিকে প্রাণ বিকাশের উপযোগী রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে হবে সূর্যালোকিত খোলা জায়গায়। এভাবেই আরেক দল বিজ্ঞানী সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার আশেপাশে প্রাণের বিকাশ হয়েছিল ধারণাকে নাকচ করে দেন।

সোসটাক স্বীকার করে নেন, গভীর সমুদ্রে প্রাণের বিকাশ হয়নি। সবচেয়ে অসম্ভবের বিষয় হলো সমুদ্রের তলদেশ প্রাণ বিকাশের উপযুক্ত রাসায়নিক পরিবেশ থেকে অনেক দূরে যেখান থেকে সায়ানাইডের মতো প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপাদনকারী উপাদান যাত্রা শুরু করতে পারে। কিন্তু এই সমস্যার 'কারণে সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা থেকে প্রাণের বিকাশ হয়েছে' এমন তত্ত্বকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। হতে পারে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলো ছিল সমুদ্রের অগভীর পানিতে যেখানে সহজেই সূর্যালোক এবং সায়ানাইড সহজেই প্রবেশ করতে পারে। আরমেন মালকিদজানিয়ান প্রাণ বিকাশের বিকল্প আর একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, সম্ভবত সমতল ভূমিতে বা আগ্নেয়গিরির লাভার কোনো অগভীর পুকুরে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল।

Maybe life began in a volcanic pond like this one in Yellowstone National Park, US

(Credit: Cothron Photography/Alamy)

আরমেন মালকিদজানিয়ান গভীরভাবে কোষের রাসায়নিক গঠন পর্যবেক্ষণ করলেন বিশেষত কোন ধরণের রাসায়নিক উপাদান কোষ নিজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেয় আর কোনগুলোকে বাইরে রাখে। তিনি বুঝতে পারলেন, সব ধরণের জৈব কোষ প্রচুর পরিমাণে ফসফেট, পটাশিয়াম এবং আরও কিছু ধাতব খনিজ উপাদান ধারণ করে কিন্তু সেখানে সোডিয়ামের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। এই মুহূর্তে আমার দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে একটা অগভীর হ্রদ বা পুকুর যাকে ঘিরে প্রাণের সে কী বাঁধভাঙা স্পন্দন!

আধুনিককালে কোষ অনেক উন্নত হয়েছে, তারা কোষের অভ্যন্তর এবং বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে কিন্তু প্রাথমিক কোষের এই সুবিধা ছিল না কারণ সেই আদি কোষের এমন আবশ্যকীয় কৌশল ছিল না। সুতরাং মানকিদজানিয়ান দাবী করেন আদি কোষ এমন কোনো স্থানে বিকশিত হয়েছিল যেখানে আধুনিক কোষ গঠনের মতোই রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণের উপস্থিতি ছিল। সুতরাং এখানেই গভীর সমুদ্রে প্রাণের যাত্রা শুরু ধারণা বাতিল হয়ে যাচ্ছে কারণ, প্রতিটি কোষ অতি উচ্চ মাত্রায় পটাশিয়াম এবং ফসফেট বহন করে এবং খুব অল্প পরিমাণ সোডিয়াম কিন্তু সমুদ্রের পানিতে সোডিয়ামের পরিমাণ অনেক বেশি।

বিজ্ঞানীগণ সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, সমুদ্র তলদেশের আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা থেকে প্রাণের বিকাশ তত্ত্বের বদলে, ভূ-পৃষ্ঠের আগ্নেয়গিরির লাভা সংলগ্ন অগভীর গরম জলাশয়েই, অত্যাবশ্যকীয় ধাতব উপাদানের সমস্ত মিশ্রণ ঠিকভাবে পাওয়া যায়; যেমনটা প্রাণ বিকাশের জন্য দরকার।

Hot springs could have been the cradle of life

(Credit: Brocken Inaglory, CC by 3.0)

সোসটাক মজা করে বলেন, “এই মুহূর্তে আমার মনে হয় আমার প্রিয় দৃশ্য হতে পারে একটা সমতলে অগভীর বিস্তৃত হ্রদ বা জলাশয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। সেখানে হয়তো গরম তরল প্রবাহ আছে কিন্তু সেগুলো গভীর সমুদ্রের আগ্নেয়গিরি নয়, বরং অগভীর জলাশয়ের আগ্নেয়গিরি আমেরিকার মনটানা এবং আইডাহো প্রদেশের ইয়েলোস্টোন পার্কের মতো।”

পৃথিবীর জন্মের পরে প্রথম পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে শুধু উল্কার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছিল। সুদারল্যান্ড প্রস্তাবিত প্রাণ সৃষ্টির রসায়ন সম্ভবত এরকম পরিবেশেই উপযুক্ত এবং কার্যকরী ছিল। বসন্তকালেই প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানের মেলবন্ধন ঘটে, কারণ তখন পানির স্তর কমে যায় এবং কিছু স্থান শুকিয়ে যায় সময়ের হাত ধরে এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি পড়ে। সর্বোপরি সোসটাক বলেন, “অগভীর বিস্তৃত হ্রদ বা জলাশয়ই হতে পারে আদি কোষের আঁতুড়ঘর। হতে পারে আদি কোষ বেশিরভাগ সময় অপেক্ষাকৃত শীতল ছিল আর এই পরিবেশ আরএনএ প্রতিলিপি সৃষ্টি এবং অন্যান্য সরল বিপাক ক্রিয়ার জন্য অতীব প্রয়োজন।

কিন্তু যখন তখন আদি কোষ উত্তপ্ত হয়ে যেত এবং উত্তাপের ফলে আরএনএ'র অভ্যন্তরীণ সুতার মতো প্রান্তগুলো আলাদা হয়ে যেত এবং পরের ধাপে কোষ নিজেই নিজের বিভাজিত প্রতিলিপি সৃষ্টি করত। সেই অগভীর বিস্তীর্ণ জলাশয়ে উষ্ণ পানির স্রোত ছিল যা আদি কোষের বিভাজনে সাহায্য করত। একই বিষয়ের বিভিন্ন আলোচনার পরে সুদারল্যান্ড আমাদের মনোযোগকে প্রাণ সৃষ্টির তৃতীয় একটি সম্ভাবনার দিকে ধাবিত করে দিলেন। তিনি বললেন, "উল্কাপতনের স্থানগুলোতেও প্রাণের বিকাশ হতে পারে।"

A meteor impact crater could be where life began

(Credit: Detlev van Ravenswaay/Science Photo Library)

আগেই আলোচনা করা হয়েছে পৃথিবীর জন্মের প্রথম পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে শুধু উল্কাপাত ঘটেছিল এবং আমরা এখনো মাঝে মাঝে উল্কাপতন দেখতে পাই। বড়সড় প্রমাণ সাইজের উল্কার আঘাতে সমতলে সৃষ্টি হতো বিশালাকার গর্ত, গর্তে পানি জমে যে হ্রদের সৃষ্টি হয় সেখানেই দেখা দেয় মানকিদজানিয়ানের প্রস্তাবিত প্রাণ বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ। প্রথমত উল্কাপিণ্ডগুলো ধাতব খনিজ উপাদানে ভরপুর। সুতরাং উল্কাপাতে আঘাতের স্থানে সৃষ্ট গর্তে বিপুল পরিমাণ লোহা এবং গন্ধকের খনিজের উপস্থিতি থাকার কথা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল উল্কার আঘাতে এবং অতি উচ্চ তাপে

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ গলে গিয়েছিল ফলে ভূপৃষ্ঠ ছিল গরম আর পানি উত্তপ্ত। যদি কোনো একটা তত্ত্বকে বাদ দেয়া হয় তাহলে তত্ত্বের সাথে বাদ পড়ে যায় অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান অথবা কোনো তত্ত্বের মধ্যে যদি আদি কোষ করার মতো কোনো উপাদান থাকে তবে তাকেও অপসারণ করা হয়।

সুদারল্যান্ড অনুমান করেন ছোট নদী, স্রোতস্বিনী পানির প্রবাহ উল্কার আঘাতে ধ্বসে যাওয়া ঢালু থেকে নামতে থাকে, পাথর থেকে বয়ে আনা দ্রবণীয় সায়ানাইডের রাসায়নিক খনিজ উপাদান আর উপর থেকে সূর্য ঢালছে অতিবেগুনী রশ্মির আলোর বৃষ্টি। পানি বা আলো প্রতিটি প্রবাহেরই ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক মিশ্রণ আছে ফলে প্রতিটি প্রবাহের মিলনে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে এবং এভাবে সময়ের হাত ধরে জলাধারে উৎপাদিত হচ্ছে প্রথম জীবনের আধার।

শেষ পর্যন্ত রাসায়নিক তরলের প্রবাহ পতিত হচ্ছে সক্রিয় আগ্নেয়গিরির জলাশয়ের তলদেশে আর সেখানে রয়েছে উল্কা পিণ্ডের আঘাতের চিহ্ন। সম্ভবত এরকম একটা জলাশয়ের পরিবেশেই প্রাণের সব উপাদান একত্রে মিলিত হয়েছিল এবং গঠিত হল প্রথম আদি কোষ। সুদারল্যান্ড প্রাণ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে খুবই সুবিন্যস্ত এবং পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু সুদারল্যান্ড পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত রাসায়নিক বিক্রিয়াকেই প্রাণ সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে বেছে নিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বললেন, একমাত্র বিজ্ঞান সমর্থিত রসায়নকেই তিনি যথোপযুক্ত মনে করেন। সোসটাক কিন্তু এই পথে হাঁটলেন না কিন্তু একমত পোষণ করলেন যে সুদারল্যান্ডের তত্ত্ব সতর্ক পর্যবেক্ষণের যোগ্য দাবীদার। সোসটাক বলেন, "আমি মনে করি, উল্কাপাতের আঘাতে সৃষ্ট গভীর খাদে জমা পানিতে যথেষ্ট খনিজ মৌল বিদ্যমান এবং সেখানে প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব এবং এই তত্ত্ব যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। একই সাথে আমি এটাও মনে করি সমুদ্রের গভীরে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে নির্গত গরম লাভা মিশ্রিত উষ্ণ পানি থেকেও প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে। দুইটি বিতর্কের স্বপক্ষেই প্রচুর যুক্তি এবং প্রতিযুক্তি আছে।" অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে বিজ্ঞান-সভার বিতর্ক এখন যুক্তির লড়াই মঞ্চের

মতো চাঙ্গা। কিন্তু মনে হয় না কোনো পক্ষই দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন। সিদ্ধান্ত হবে রসায়ন এবং আদি কোষের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে।

Vents on the East Scotia Ridge

(Credit: A. D. Rogers et al, PLoS Biology, CC by 2.5)

এই বিতর্কের ইতিবাচক দিক হলো, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রথম দীর্ঘদিনের চলমান পৃথিবীতে কীভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল বিতর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেখতে যাচ্ছি। সুদারল্যান্ডের কাছে মনে হয়, মনে হচ্ছে এখনো অনেক অর্জন বাকি। আমরা সর্বোচ্চ যেটা করতে পারি তা হলো, "রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল দেখে আমরা পৃথিবীর প্রথমদিকের যা বুঝতে পারি এবং বিভিন্ন প্রাচীন প্রাণীর ফসিল যা কিছু বিজ্ঞান উন্মোচন করতে পেরেছে এবং আমাদের কাছে যত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ আছে তা দিয়ে গল্পের ইতি টানতে পারি। শেষ পর্যন্ত প্রায় এক শতকের দীর্ঘ বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণের খণ্ড খণ্ড গবেষণার মিলিত প্রচেষ্টায় একটা দৃশ্যমান সমাধানের পথে এগিয়ে যাচ্ছি।" এখন পর্যন্ত সোসটাক এবং সুদারল্যান্ডের প্রস্তাবিত 'সবকিছু একবারে সৃষ্টি হয়েছিল' তত্ত্ব আমাদের সামনে শুধুই রেখা চিত্রের মতো নান্দনিক উপস্থাপনা। কিন্তু এই দুই বিজ্ঞানীদ্বয়ের পদক্ষেপ এত দশকের চলমান গবেষণার সমর্থনে হয়তো সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হবে। 'সবকিছু

একবারে সৃষ্টি হয়েছিল’ তত্ত্ব জীবনের যাত্রা শুরুর দরকারি এবং কার্যকরী সব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। এটা প্রতিটি তত্ত্বের ইতিবাচক দিকগুলোকে একই সুতোয় বাঁধার চেষ্টা করে একই সাথে মূল জীবনের উৎস সন্ধানে এতদিনের জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ‘সবকিছু একবারে সৃষ্টি হয়েছিল’ তত্ত্ব রাসেলের সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গীরন হওয়া লাভামিশ্রিত গরম পানির স্রোতের এলাকায় প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল সেই তত্ত্বকেও ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করে না বরং বিভিন্ন তত্ত্বের সম্ভাব্য দিকগুলোকে একত্র করা হয়।

আমরা প্রকৃতপক্ষে জানি না চারশত কোটি বছর আগে ঠিক কী ঘটেছিল। মার্টিন বলেন, “যদি কৃত্রিমভাবে এখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্র তৈরি করা যায় এবং এসচেরিচিয়া কলি নামের ব্যাকটেরিয়া উঁকি দেয় অন্য প্রান্তে তবুও প্রমাণ করা সম্ভব নয় কীভাবে প্রাণী বেড়ে উঠেছিল”

Our discoveries change how we see the world

(Credit: Nasa/ESA/Samantha Cristoforetti)

অর্থাৎ আমরা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিভক্তির কাছাকাছি চলে আসছি। পার্থক্য হল একদল মানুষ যারা প্রাণের যাত্রা শুরুর কাহিনি জানে আর যারা জানে

না। পৃথিবীতে আজ যারা জীবিত আছে তাদের মাঝে কিছু মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত সততার সাথে বলতে পারবে কোথা থেকে তারা এসেছে। মানুষ জানতে পারছে তাদের পূর্বপুরুষ কারা এবং কোথায় ছিল তাদের বসবাস। **১৮৫৯** সালে ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস' প্রকাশের আগে প্রতিটি মানুষ তাদের জন্ম এবং উৎসের ইতিহাস না জেনে অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকেই মরে গেছে কারণ তারা কেউ বিবর্তনের বিন্দু বিসর্গ কিছু জানত না। কিন্তু বর্তমান কালের জীবিত মানুষ এমনকি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী চাইলেই তাদের জন্মের ইতিহাস জানতে পারবে এবং আবিষ্কার করবে প্রাণী জগতের সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। অনুরূপভাবে **১৯৬১** সালে ইউরি গ্যাগারিনের পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর যারা জন্মেছে তারা এমন একটা সমাজে বসবাস করছে যেখানে সবাই মহাবিশ্বে ভ্রমণ করছে। এমনকি আমরা কেউ সশরীরে মহাশূন্যে না গেলেও বিভিন্ন নভোযান কিন্তু ঠিকই বাস্তবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিবর্তন, প্রাণের উৎস সন্ধান, নভোযানের মহাশূন্যে পরিক্রমা ইত্যাদি বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব নীরবে সূক্ষ্মভাবে পালটে দিচ্ছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় এসব বিষয় আমাদেরকে অতীতের থেকে অনেক বেশি তথ্য সমৃদ্ধ করেছে। বিবর্তন আমাদেরকে প্রতিটি প্রাণীকে মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছে, কারণ মানুষ জানতে পেরেছে সব প্রাণীই তাদের দূর সম্পর্কের বা নিকটাত্মীয়। নভোযানে চড়ে এখন আমরা মহাশূন্যে থেকে আমাদের পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি এবং একই সাথে বুঝতে পারছি আমাদের; আমদের প্রাণীজগৎ এবং পৃথিবী কত অনন্য অসাধারণ এবং কত নাজুক ও অসহায়। এই জ্ঞান আমাদের মনোজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। পুরোপুরি বিজ্ঞানের তথ্য, প্রমাণ, গবেষণার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি কীভাবে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব হয়েছে এবং তাদের উৎস খুঁজতে হবে। একইসাথে বিজ্ঞান গবেষণা আমদেরকে বলছে প্রাণের প্রকৃতি। কিন্তু তারপরেও এখনো আমরা জানতে পারিনি কীভাবে জন্ম নিলো প্রাণের প্রজ্ঞা!